

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**BENGALI****CODE:19****সূচীপত্র****Unit 1 - বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ****Sub Unit – 1:**

- ১.১.১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্বনি তাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- ১.১.২. মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- ১.১.২.১. সাহিত্যিক প্রকৃতি
- ১.২.৩. নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

Sub Unit – 2:

- ১.২.১. বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস

Sub Unit – 3:

- ১.৩.১. প্রাচীন বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- ১.৩.২. মধ্য বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
- ১.৩.৩. আধুনিক বাংলার বৈশিষ্ট্য

Sub Unit – 4:

- ১.৪.১. বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উপভাষা

Sub Unit – 5:

- ১.৫.১. স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ
- ১.৫.২. অক্ষর গঠনের প্রকৃতি
- ১.৫.৩. ধ্বনি পরিবর্তন

Sub Unit – 6:

- ১.৬.১. সন্ধি
- ১.৬.২. সমাস
- ১.৬.৩. প্রকৃতি-প্রত্যয়
- ১.৬.৪. কারক বিভক্তি
- ১.৬.৫. লিঙ্গ
- ১.৬.৬. বচন
- ১.৬.৭. পদপরিচয়

Sub Unit – 7:

- ১.৭.১. বাংলা শব্দ ভান্ডার
- ১.৭.২. শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

Sub unit - 1

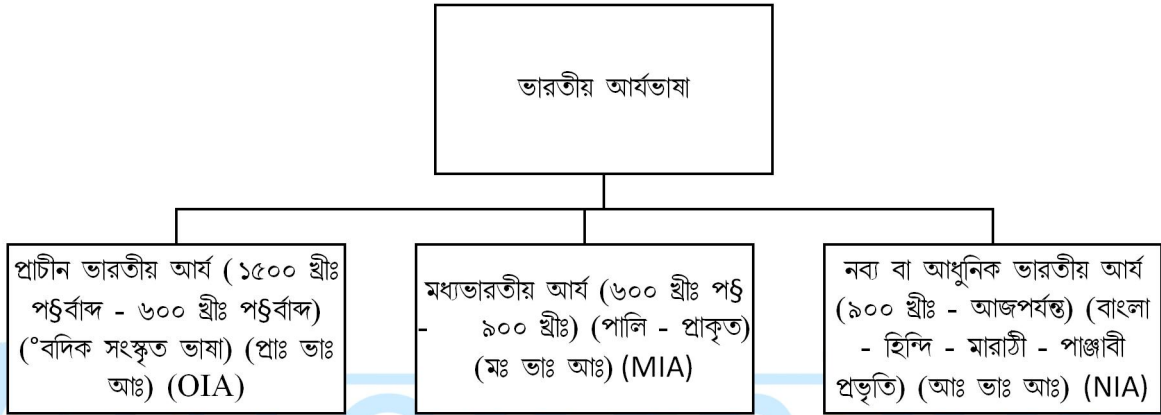
১.১.১ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্রুতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(১) ভারতীয় আর্যভাষা : সংজ্ঞা

পণ্ডিতদের অনুমান, খ্রিস্টজন্মের ১৫০০ বছর আগেই আর্যভাষা-ভাষী এক বা একাধিক গোষ্ঠী ভারতে আসে। ভারতে এসে এরা যে-ভাষা ব্যবহার করেছিল, তাকেই বলা হয় ‘ভারতীয় আর্যভাষা’।

(২) ভারতীয় আর্যভাষার

শ্রেণীবিভাগ :



আর্যরা ভারতে আসে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তারা এদেশে এসে যে-ভাষা ব্যবহার করে, তার নাম ‘ভারতীয় আর্যভাষা’। তাদের আগমনকাল থেকে আজ পর্যন্ত, প্রায় ৩৫০০ বছর ধরে ভারতে সেই ‘ভারতীয় আর্যভাষা’ নানা রূপের মধ্য দিয়ে আজও বর্তমান আছে। এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসকে লক্ষণীয় পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি প্রধান যুগে বা স্তরে ভাগ করা হয় :

- ১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (Old Indo-Aryan = সংক্ষেপে OIA)
- ২) মধ্য ভারতীয় আর্য (Middle Indo-Aryan = MIA)
- ৩) নব্য ভারতীয় আর্য (New Indo-Aryan = NIA)।

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক-সংস্কৃত) : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞা : পণ্ডিতদের অনুমান, আর্যরা ভারতে আসে ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। তারা এদেশে এসে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ও সাহিত্য-সৃষ্টিতে যে - ভাষা ব্যবহার করেছিল, তার নাম ‘ভারতীয় আর্যভাষা’। মুখের ভাষা কালে কালে পাটে যায়, সেই পাল্টানোর নানা লক্ষণও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নানা যুগের সাহিত্যে সেই পাটে যাওয়া ভাষার প্রমাণ আছে। ভারতীয় আর্যভাষাও ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত প্রধান তিনটি স্তরে বিবর্তিত হয়েছে - আদিস্তর, মধ্যস্তর ও অন্ত্যস্তর। ভাষাতাত্ত্বিকদের ভাষায়, সেই তিনটি স্তরের নাম ‘প্রাচীন ভারতীয় আর্য’, ‘মধ্যভারতীয় আর্য’ ও ‘নব্যভারতীয় আর্য’। সুতরাং আর্যরা ভারতে আসার দিন থেকে প্রথমস্তরে বা প্রথমযুগে যে-ভাষা ব্যবহার করেছিল, তাকেই বলা হয় ‘প্রাচীন ভারতীয় আর্য-ভাষা’।

■ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিকাল

পণ্ডিতদের অনুমান, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্থিতিকাল হলো ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ।

■ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার নিদর্শন = ঋকবেদ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রধান নিদর্শন হলো ‘বেদ’। তবে, বেদের সবটা বা চারটি ভাগই (ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব) নয়-তার প্রথম ভাগ ‘ঋকবেদ সংহিতা’ই হলো প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার সর্বাধিক প্রামাণ্য নিদর্শন।

■ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা সাধারণ লক্ষণ

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সুদীর্ঘকাল ধরে (১৫০০ খ্রীঃ পূঃ - ৬০০ খ্রীঃ পূঃ) ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ভাষায় ‘ঋক’ বেদের মতো একটি গ্রন্থও রচিত হয়েছে। পণ্ডিতেরা এই ভাষার মধ্যে নানা ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেছেন। তা থেকেই এই ভাষার স্বরূপটি নিগীত হলো :

■ এক ■ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ঋ, ঌ, ॠ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি স্বরধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল। (বেদের পরবর্তী যুগে ছিল না, বা লোপ পেয়েছিল)।
২. এই ভাষায় শ, ষ, স, ঙ প্রভৃতি ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বর্তমান ছিল।
(বেদের পরবর্তীযুগে এগুলি ছিল না বা লোপ পেয়েছিল)
৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দের আদি স্থান ছাড়া অন্যত্র বিবিধ যুক্ত-ব্যঞ্জনের প্রচুর ব্যবহার ছিল। যেমন :- ভ্র, ক্র, ক্ষ, ঙ্গ, দ্ব, দ্ধ, ঙ্গ, ক্রব, স্ম, ঙ্গ প্রভৃতি। (বেদের পরবর্তীকালে যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার সমীভূত হয়েছে - আরো পরে নব্য - ভারতীয়-আর্যে তা একক ব্যঞ্জে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন - প্রা - ভা - আ - কস্ম > ম - ভা - আ কস্ম > ন - ভা - আ কাম (কাজ)।
৪. প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় যত্রতত্র সন্ধি লেগেই ছিল।
৫. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় এক বিশেষ শ্রেণীর স্বরাঘাত (Pitch accent) বর্তমান ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই স্বরাঘাত দেবার প্রবণতাটি ছিল তিন রকম - ‘উচ্চ’ বা ‘উদাও’, ‘নিম্ন’ বা অনুদাও এবং ‘মধ্যম’ বা ‘স্বরিত’। একটি শব্দের অন্তর্গত যে-কোনো অক্ষরেই জোর দিয়ে উচ্চারণ করা যেতো। অর্থাৎ শব্দের প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধ্বনিতে বক্তার ইচ্ছানুসারে এই জোর বা স্বরাঘাত পড়তো। তাতে একটা অসুবিধাও ঘটতো। শব্দের প্রথম ধ্বনিতে জোর দিলে শব্দের যে মানে হতো, দ্বিতীয় ধ্বনিতে জোর দিলে সে-মানে আর থাকতো না, - মানে পাল্টে যেতো। ভাষাতাত্ত্বিক তার উদাহরণ দিয়েছেন - ‘রাজপুত্র’ শব্দটি। এতে ‘রা’ এ জোর বা স্বরাঘাত দিলে (রাজপুত্র =) মানে হয় - রাজা যার পুত্র (= রাজার বাবা)। কিন্তু ‘এ’-তে জোর দিলে (রাজপুত্র =) মানে হয় - রাজার পুত্র (রাজার ছেলে)। (দ্রঃ Macdunell-A Vedic Grammar for Students, (1971), P.455)। তেমনি - মাতৃ (= পরিমাপকারী), মাতৃ (= মা)।
৬. অনুরূপে স্বরাঘাতের স্থান পরিবর্তনে শব্দের স্বরধ্বনিগুলিরও গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এই গুণ বৃদ্ধি সম্প্রসারণ তখনকার ভাষায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। যেমন:-
‘যাজ্’ ধাতুর তিনটি রূপ - যজ্জ, যাগ, ইষ্ট।
‘স্বপ্’ ধাতুর তিনটি রূপ - স্বপ্ন, স্বাস, সুপ্ত।
- এগুলিতে স্বরধ্বনিগুলির গুণ, বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটেছে।
৭. প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বর্ণমালায় প্রতিটি বর্ণে একটি করে আনুনাসিক ধ্বনি আছে। যেমন - ‘ক’ বর্ণে ঙ্গ, ‘চ’ বর্ণে ঞ্গ, ‘ট’ বর্ণে ণ এবং ‘ত’ বর্ণে ন এবং ‘প’ বর্ণে ম। এবং প্রতিটি ধ্বনিরই বিশিষ্ট উচ্চারণ পার্থক্যও ছিল।

■ দুই ■ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

- ১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ক্রিয়ার কাল ছিল ৫টি:
লট - বর্তমান
লৃট - ভবিষ্যৎ
লঙ, লুঙ, লিট - অতীত
- ২। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় ক্রিয়ার ভাব (Mood) ছিল পাঁচটি:
লোট - অভিপ্রায়
লোট - অনুজ্ঞা
বিধিলিঙ্গ - নির্বন্ধ, নির্দেশক ও সন্দ্বাবক।
- ৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে বচন ছিল ৩টি:
একবচন দ্বিবচন বহুবচন
- ৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পুরুষ ছিল ৩টি:
উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ প্রথম পুরুষ

৫। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে **লিঙ্গ** ছিল ৩টি:

পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ

- তখন লিঙ্গ নির্ভর করতো ব্যাকরণ নির্দিষ্ট পথে। যেমন - ‘নদী’ বা ‘লতা’ এখনকার ভাবনায় ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যে সেগুলি ছিল স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যাকরণে তাই কোন শব্দ কী লিঙ্গ হবে, তা নির্দিষ্ট হয়েছে। সেজন্য ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, প্রাচীন-ভারতীয়-আর্যে লিঙ্গ ছিল নির্দিষ্ট ব্যাকরণ সম্মত।

৬। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে **কারক** ছিল ৮টি:

কর্তৃ কর্ম করন সম্প্রদান

অপাদান অধিকরণ সম্বন্ধপদ সম্বোধনপদ।

৭। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে **ক্রিয়া বিভক্তির** রূপ ছিল ২টি:

আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ।

৮। এই ভাষায় বাচ্য ছিল - ২টি: কর্তৃবাচ্য ও কর্ম-ভাববাচ্য।

৯। এই ভাষায় **প্রত্যয়** ছিল - ২টি: কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিৎ প্রত্যয়।

প্রত্যয়যোগে তৈরী হয়েছিল প্রচুর নতুন শব্দ। ধাতুর সঙ্গে ‘অক’ ‘আলু’ ‘শত্’ ‘ইষু’ ‘ষিক’ প্রভৃতি যোগে কৃৎপ্রত্যয় হতো - যেমন : চল + ইষু = চলিষু, উৎ-কৃষ + ঘঞ = উৎকৃষ। তেমনি শব্দের সঙ্গে ষিঃ, ষিঃক্, বতুপ, মতুপ প্রভৃতি যোগে হতো তদ্ধিৎ প্রত্যয় - দশরথ + ষিঃ = দাশরথি, প্রজ্ঞা + বতুপ = প্রজ্ঞাবান।

১০। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে **উপসর্গ** ছিল - এগুলি শব্দ বা ধাতুর আদিতে বসতো - তবে বৈদিকযুগে এদের স্বাধীন ব্যবহারও ছিল। পরবর্তী ক্লাসিক সংস্কৃতে উপসর্গ দাঁড়ালো ২০টিতে - প্র, পরা, অপ, সম প্রভৃতি। পরি-জন = পরিজন। প্র-বাহ = প্রবাহ।

১১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে প্রচুর **অসমাপিকা** ক্রিয়া বর্তমান ছিল। অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হতো - ধাতুর সঙ্গে ত্বা, ত্বায়, ভ্রাচ, লাপ প্রভৃতি যোগে - √দৃশ্ + ত্বা = দৃষ্টা। পঠিত্বা, শ্রুত্বা।

১২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বাক্যগঠনে **পদবিন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না**। তবে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতির বিভক্তি চিহ্ন গুলি সুনির্দিষ্ট ছিল বলে কোনো বাক্যের মধ্যে সেগুলি যেখানেই বসুক না কেন, তাদের চিনে নিতে বেগ পেতে হতো না। তাই বাক্যের অর্থ ভেঙে পড়তো না। যেমন : ‘রসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্’ আবার ‘কাব্যং রসাত্মকং ব্যাক্যম্’ পদবিন্যাসও ঠিক। তেমনি - ‘বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্’ও ঠিক।

১৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্য-বৈদিকে একাধিক পদে সমাস হতো না। পাশাপাশি অবস্থিত দুই পদে সমাস হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে সংস্কৃতে সমাসের ঘনঘটা দেখা গেল।

১৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ছন্দ ছিল অক্ষরমূলক - অর্থাৎ অক্ষর গুণে গুণে এবং অক্ষরের লঘু গুরু মেনে মাত্রা নির্ণীত হতো। এতে সুর বা তানের প্রাধান্য ছিল। শেষদিকে ছন্দ হয়েছিল মাত্রামূলক।

১.১.২ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার ধ্রুনিতাত্ত্বিক রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৩. মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (প্রাকৃত) : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

■ সংজ্ঞা ও স্থিতিকাল

ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় বা মধ্যবর্তী স্তরের নাম ‘মধ্যভারতীয় আর্যভাষা’। পণ্ডিতদের মতে এর স্থিতিকাল - ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার ভাষাগত নাম ‘প্রাকৃতভাষা’। প্রাকৃত বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র বলেন - ‘প্রাকৃত’ এসেছে ‘প্রকৃতি’ থেকে। প্রকৃতি মানে মূলবস্তু অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার মূলবস্তু হলো - প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক সংস্কৃত। আর তার থেকেই জন্মেছে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। তাই ‘প্রকৃতি’ থেকে জন্মেছে বলেই দ্বিতীয় স্তরের ভাষার নাম ‘প্রাকৃত’।

■ যুগবিভাগ, স্থিতিকাল, নিদর্শন ও ভাষা-নাম

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট উপস্তর লক্ষ্য করেছেন পণ্ডিতেরা।

সেগুলি হলো :

(ক) প্রথম উপস্তর ■ স্থিতিকাল = খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ - খ্রীঃ ১ম

- নিদর্শন = নানা অনুশাসন
- ভাষা-নাম = (উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ-মধ্য-প্রাচ্য) প্রাকৃত।
- (খ) দ্বিতীয় উপস্বর ■ স্থিতিকাল = খ্রীঃ ১ম - ৬ষ্ঠ
- নিদর্শন = সংস্কৃত নাটকের নারী ও ভূত্যের সংলাপ
= জৈন সাহিত্য
= নানা প্রাকৃতে অপভ্রংশ অপভ্রষ্টে লেখা-কিছু মহাকাব্য - নাট্যকাব্য - গীতিকাব্য -
ছন্দঃশাস্ত্র - ব্যাকরণ প্রভৃতি।
- ভাষা-নাম = মাগধীপ্রাকৃত, শৌরসেনী প্রাকৃত, মাহারষ্ট্রী প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত, অর্ধমাগধী প্রাকৃত।
- (গ) তৃতীয় উপস্বর ■ স্থিতিকাল = খ্রীঃ ৬ষ্ঠ - ৯ম
- নিদর্শন = অপভ্রংশে লেখা-মহাকাব্য, কথানক, গীতিকাব্য, সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু সংলাপ।
- ভাষানাম = মাগধী অপভ্রংশ, শৌরসেনী অপভ্রংশ, মাহারষ্ট্রী অপভ্রংশ, পৈশাচী অপভ্রংশ অর্ধমাগধী
অপভ্রংশ।

■ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য

মধ্যভারতীয় আর্যভাষা আসলে আঞ্চলিক উপভাষার মতো। স্থানে স্থানে তার স্থানীয় নাম। অশোকের অনুশাসনগুলিতে ‘উত্তর-পশ্চিমা’, ‘দক্ষিণ-পশ্চিমা’, ‘প্রাচ্য-মধ্য’ ও ‘প্রাচ্য’ - এই চার রকমের ‘আঞ্চলিক প্রাকৃতে’র সন্ধান মেলে। ‘সুতনুকা’ প্রত্নলেখ তার একটি উদাহরণ। তেমনি প্রচলিত প্রাকৃতগুলির নাম ‘মাগধী’, ‘শৌরসেনী’, ‘মাহারষ্ট্রী’, ‘পৈশাচী’ ও ‘অর্ধমাগধী’। আবার এই পাঁচ নামেই অপভ্রংশ প্রচলিত। পণ্ডিতেরা এগুলির পৃথক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছেন। আবার এগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যও বলেছেন। তাঁদের সেই নির্দেশ মেনেই আমরা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করছি :

■ এক ॥ ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ■

১. মধ্যভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।
২. ঙ, দীর্ঘ ঙ, ঞ-কার সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে।
৩. ঞ-কার নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে - কখনো ‘অ’, ‘ই’, ‘উ’, ‘এ’- কখনো ঞ হয়েছে ‘র’, ‘রি’, ‘রু’,
যেমন : ঞ > অ - মৃগ মগা তৃণ > তণ ঞ > এ - বৃন্ত > বেন্ট
 ঞ > ই - মৃগ > মিগা হৃদয় > হিঅঅ ঞ > র - বৃক্ষ > রুক্ষ
 ঞ > উ - মৃগ > মুগা জু > উজু ঞ > রি - ঞষি > রিসি
৪. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ঐ-কার ‘এ’ - করে এবং ও-কার ‘ও’ - করে পরিণত হয়েছে।
যেমন : ঐ > এ - বৈদ্য > বেজ্জ, তৈল > তেল, তেল, মৌক্তিক > মোক্তিক।
 ও > ও - কৌমুদী, কৌমুই, ওষধ > ওসধ, গৌরী > গোরী।
৫. যুক্ত ব্যঞ্জননের পূর্ববর্তী আ, ঈ, উ - ধ্বনির হ্রস্বতা।
যেমন : আ > অ - কাব্য > কব্বা কান্ত > কন্ত। কার্য > কজ্জ।
 ঈ > ই - কীর্তি > কিত্তি। তীক্ষ্ণ > তিক্খ।
 উ > উ - মুহূর্ত > মুমুত্ত। মূল্য > মুল্ল।
৬. যুক্তব্যঞ্জননের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে।
যেমন : অ > আ - অশ্ব > আস, স্পর্শ > ফাস।
 ই > ঈ - শিষ্য > সীস, বিশ্রাম > বীসাম।
 উ > ঊ - দুর্লভ > দুডহ, দুঃসহ > দূসহ।
৭. পদান্তস্থিত অনুস্বরের পূর্ববর্তী দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়েছে।
যেমন: পংশু > পংশু। কান্তাং > কন্তং।

৮. পদমধ্যস্থ অনুস্বার লোপ পেলো হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে

যেমন: বিংশত > বীসা। ত্রিংশত > তীসা।

৯. ‘অয়’ এবং ‘অব’ যথাক্রমে ‘এ’ এবং ও-কারে পরিণতি লাভ করেছে।

যেমন: অয় > এ - কথয়তু > কথেতু। পূজয়তি > পূজেতি, পূজেই।

অব > ও - লবণ > লোণ। ভবতি > ভোদি।

১০. তবে, পদের শেষে যুক্তব্যঞ্জন না - থাকলে অনুস্বার রক্ষিত হয়েছে।

যেমন : নরম (নরং) > নরং।

১১. পদান্তস্থিত বিসর্গ কখনো ‘এ’ বা ‘ও’ হয়েছে। কখনো লোপ পেয়েছে।

যেমন: ঃ > এ - জনঃ > জনে

ঃ > ও - জনঃ > জনো

ঃ > লোপ - জনঃ > জন, মুনিঃ > মুনি

১২. পদান্তস্থিত ‘ম’ বা ‘ন’ থেকে জাত অনুস্বার ছাড়া অন্যান্য সকল ব্যঞ্জন লোপ পেয়েছে।

যেমন: নরান > নরা। পুত্রাৎ > পুত্রা।

১৩. মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় ‘শ’, ‘ষ’, ‘স’ - এই তিনটি শিসধ্বনির নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে -

(ক) মাগধী প্রাকৃতে ‘শ’ আছে, অন্য দুটি নেই। যেমন :

সুতনুকা > শুতনুকা (শুতনুক নম দেবদশিক্য)।

(খ) অন্যান্য প্রাকৃত গুলিতে ‘স’ আছে। অন্য দুটি নেই। যেমন :

দ্বাদশ > দুবাদস। তিষ্ঠন্ত > তিস্ঠন্তো।

১৪. মধ্যভারতীয় আর্যে দন্ত্যবর্ণ (ত, থ, দ, ধ, ন) স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূর্ধ্য বর্ণে (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ) পরিণত হয়েছে। কখনো বা দন্ত্যবর্ণ গুলি ঋ, র, শ, ষ যোগে ‘ণ’ বর্ণে পরিণত হয়েছে। যেমন: বিকৃত > বিকটা। দ্বাদশ > দুবাদস।

১৫. পদের আদিস্থিত যুক্তব্যঞ্জন কখনো একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে, কখনো বিশিষ্ট হয়েছে।

যেমন : ব্রাস্তণ > বস্বনা। ত্রীনি > তিন্নি।

১৬. পদের মধ্যস্থিত বা অন্ত্যস্থিত যুক্তব্যঞ্জন যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে।

যেমন: মধ্যস্থিত = কল্যাণম > কল্লাণৎ।

অন্ত্যস্থিত = ভক্ত > ভক্ত।

১৭. কখনো কখনো (দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপস্তরে) পদমধ্যস্থিত একক ব্যঞ্জন -

(ক) অল্পপ্ৰাণ হলে লোপ পেয়েছে। যেমন:

শোক > শোঅ

(খ) মহাপ্রাণ হলে ‘হ’-কারে পরিণত হয়েছে।

যেমন: শেফালিকা > সেহালিআ।

১৮. অনেকসময় অযোষধ্বনি সযোষ হয়েছে।

যেমন: দীপ > দীব, শকট > সগড, ঋতু > উদু, কলাপ > কলাব।

দুই ॥ রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় দ্বিবচন লুপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ এক বোঝাতে একবচন এবং একের অধিক বোঝাতে বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

যেমন: একবচন > বহুবচন

পূজো > পূজ। গঈ > গই, গঈউ, গঈও।

২। লিঙ্গ বিধি : মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় শব্দান্তস্থিত ব্যঞ্জনলোপের জন্যে প্রথমা ও দ্বিতীয় বিভক্তির বহুবচনে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ভেদ নাই।

যেমন: ফলানি > ফলা

নরান্ > নরা

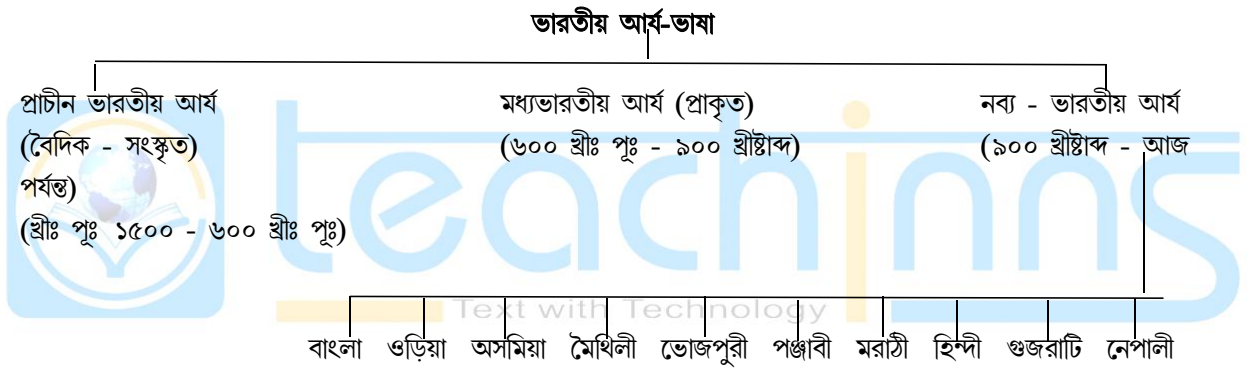
- ৩। ধাতুরূপে আত্মনেপদের লোপ। সর্বত্রই পরস্মৈপদের ব্যবহার।
- ৪। শব্দরূপে চতুর্থী বিভক্তির লোপ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সাদৃশ্যনিতির প্রয়োগ, শব্দরূপে ও ধাতুরূপের সরলতা - এযুগের ভাষার প্রধান উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য।
- ৫। মধ্যভারতীয় আর্যে দশটি গণের মধ্যে একমাত্র ভূদি গণই বর্তমান আছে (অন্য নটি গণ লোপ পেয়েছে)।
- ৬। এযুগের ভাষায় ক্রিয়ার কালের রূপ গুলি হলো নিম্নরূপ:
- বর্তমান কাল - নির্দেশক (লট), অনুজ্ঞা (লোট), সদ্ভাবক (বিধিলিঙ)।
- অতীত কাল - লুট-এর লোপ; লঙ ও লুঙের একাত্মীকরণ।
- ভবিষ্যৎ কাল - লুট - ছাড়া অন্যগুলির যোগ।
- ৭। এযুগের ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়ার বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে।
- আবার নিষ্ঠান্ত (ক্ৰে প্রত্যন্ত) পদ অতীতকালের অর্থে সমাপিকা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ৮। মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্তির লোপ পেয়েছে বলে পদস্থাপন বা বাক্যগঠন রীতিতে কঠোরতা বা সংযম এসেছে।
- ৯। এযুগের ভাষায় অধিকাংশ বিভক্তি লোপ পেয়েছে। সেজন্যে বিভিন্ন শব্দকে অনুসর্গরূপ ব্যবহার করা হয়েছে।

১.১.৩ নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য

৩. নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার : সাধারণ বৈশিষ্ট্য

(New Indo-Aryan and its Linguistic Features)

ন.ভা.আ. (NIA)



■ **সংজ্ঞা :** খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষা থেকে জাত, যে সব আঞ্চলিক ভাষা সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ভূত হয়েছিল এবং আজও নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে চলেছে, তাদের নব্যভারতীয় আর্যভাষা বলে। যেমন : বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, হিন্দী, গুজরাটী, নেপালী, বাঘেলী প্রভৃতি।

সংজ্ঞা-বিস্তৃতি : সুতরাং নব্যভারতীয় আর্যভাষার

- (ক) জন্ম / উৎস - মধ্যভারতীয় আর্যভাষা প্রাকৃত বা লৌকিক ভাষা অপভ্রংশ বা অবহট্ট থেকে।
- (খ) জন্ম / উদ্ভব কাল - (আনুমানিক) খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।
- (গ) নিদর্শন ও ভৌগোলিক বণ্টন - আজকে অখন্ড ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে, সেগুলিই হলো নব্যভারতীয় আর্যভাষার আঞ্চলিক বা স্থানীয় নাম।
- প্রচলিত অঞ্চল-নাম অনুসারে পণ্ডিতেরা এগুলির নাম দিয়েছেন :
- (ক) প্রাচ্য-মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত - বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, মৈথিলী, ভোজপুরী।
- (খ) প্রাচ্য-মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত - বাঘেলী, ছত্রিশগড়ী।
- (গ) উত্তর (হিমালয়) অংশে প্রচলিত - নেপালী, গাড়োয়ালী, গোখালী।
- (ঘ) উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রচলিত - সিন্ধী, পাঞ্জাবী।
- (ঙ) মধ্যদেশে প্রচলিত - হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাটী।
- (চ) দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত - মারাঠী, কোঙ্কনী।
- এই যে প্রচলিত অঞ্চল বা স্থান অনুসারে ভাষাসম্প্রদায়গুলির ভৌগোলিক জরিপ, তাকেই বলে 'ভৌগোলিক

বগীকরণ’।

■ নব্যভারতীয় আর্থভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ■

‘নব্যভারতীয় আর্থভাষা’ - একটি নয়, অনেকগুলি, তাম্র ভারতবর্ষের এক এক অঞ্চলে সেগুলির এক এক নাম। যেমন - বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, হিন্দী, ভোজপুরী, গুজরাটী, নেপালী প্রভৃতি। এগুলির উৎস সাধারণ বিচারে অবশ্যই মধ্যভারতীয় আর্থভাষা - প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। আর জন্ম উৎস এক বলেই, এগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগত অনেক সাধারণ মিল বা লক্ষণ বর্তমান। অঞ্চল বিশেষে দীর্ঘদিন প্রচলিত বলেই, এদের নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। আমরা সেই নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যটুকু বাদ দিয়ে এদের ভাষাতত্ত্বগত সাধারণ লক্ষণগুলিই এখানে আলোচনা করা হয়েছে :

এক ।। ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১. পদান্তস্থিত স্বরধ্বনি নব্যভারতীয় আর্থভাষায় লোপ পেয়েছে অথবা বিকৃত হয়েছে।

যেমন : সং মিহির > ন. ভা. আ. (বাংলা) মিহির। রাম > রাম।

সং জল > জল। গৌরব > গৌরব। প্রদীপ > প্রদীপ।

২. পদমধ্যস্থ দ্বিস্বরধ্বনির (ইঅ, ঈআ, উঅ, উআ) শেষটি ‘অ’ অথবা ‘আ’ হলে - তা লুপ্ত হয়েছে।

যেমন : মৃত্তিকা > মট্টিআ > মাটি।

৩. কখনো কখনো পদমধ্যস্থিত ‘ইঅ’ বা ‘উঅ’ যথাক্রমে ‘ঈ’ বা ‘উ’ হয়েছে।

যেমন : ঘৃত > ঘিঅ > ঘী।

৪. পদমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জন একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে তার পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর ক্ষতিপূরণ বাবদ দীর্ঘস্বর হয়েছে।

যেমন : কার্য > কজ্জ > কাজ। ধর্ম > ধম্ম > ধাম। নৃত্য > নচ্চ > নাচ।

হস্ত > হথ > হাত। তক্ষ > টক্ষ > টাকা। পক্ক > পক্ক > পাক।

৫. যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটি নাসিক্য ধ্বনি হলে (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম), সেটি ক্ষীণ হয়ে লোপ পায় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে।

যেমন : সন্ধ্যা > সঞঝা > সাঝ।

অঞ্চল > অঞ্চল > আঁচল।

সন্তার > সংতার > সাঁতার।

নিষু > নিংবু > নেবু।

কন্টক > কংটঅ > কাঁট (কাঁটা)।

চন্ডাল > চংডাল > চাঁড়াল।

৬. দুই স্তরের মধ্যবর্তী একক অল্পপ্রাণ স্পর্শব্যঞ্জন থাকলে, তার সংশ্লিষ্ট স্বরটির নানা পরিণতি ঘটে :

(ক) কখনো উদ্ধৃও স্বরটি লোপ পায় -

ঘৃত (ঘ্ + ঋ + ত্ + অ (উদ্ধৃওস্বর)) > ঘিঅ > ঘী।

(খ) কখনো পার্শ্ববর্তী স্বরের সঙ্গে উদ্ধৃও স্বরটির সন্ধি হয় -

গত + ইল্ল > গেল [গত > গঅ, গআ। গঅ + ইল (< ইল্ল)]

(গ) কখনো উদ্ধৃত স্বরটি পার্শ্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে দ্বিস্বর হয় -

অ + উ = ও - বধু > বউ > বৌ (ব্ + অ + ধ + উ > ব্ + অ + উ) - মধু > মউ > মৌ।

৭. নব্যভারতীয় আর্থ্যে বহু বিদেশী ভাষার শব্দ ঢুকেছে। সেই সব বিদেশী শব্দের প্রভাবে নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :

ক - কলেজ

জ - জর্জ

খ - গ

ফ

দুই ।। রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। **লিঙ্গ**: নব্যভারতীয় আর্থ্যে প্রাচীনভারতীয় আর্থ্যের লিঙ্গবিধি যথাযথ ভাবে রক্ষিত হয় নি। (১) মারাঠী ও গুজরাটী ভিন্ন অন্য সব ভাষার ক্লীবলিঙ্গ লোপ পেয়েছে। (২) সিংহলীতে ‘সপ্রাণ’ ও ‘অপ্রাণ’ নামের নতুন দুটি লিঙ্গ সৃষ্ট হয়েছে। (৩) অনেকগুলি নব্যভারতীয় আর্থ্যে শব্দের অর্থ অনুসারে লিঙ্গ নির্ণীত হয়েছে। (এবং সংস্কৃতির নিয়ম মানা হয় নি) যেমন :- সংস্কৃতে ‘লতা’ বা ‘নদী’ ক্লী লিঙ্গ; নব্যভারতীয় আর্থ্যের বাংলায় ‘লতা’ বা ‘নদী’ ক্লীবলিঙ্গ। (৪) বাংলায় সর্বনামে লিঙ্গ ভেদ উঠে গেছে। যেমন :- নারী বা পুরুষ - উভয়েই বলে - ‘আমি’ ব্যাকরণ পড়ি। নারী বা পুরুষ - উভয়দলকে দেখিয়েই বলি - ‘তোরা যা’।

২। **বচন:** নব্যভারতীয় আর্যে বচন দু রকম - একবচন, বহুবচন। কিন্তু সংস্কৃতের মতো এখানে দু রকম বচনের রূপভেদ নেই। এখন বহুবচন হলো - (ক) বহুবচন পৃথক শব্দ (সব, সকল, দল, সমস্ত, গুলি) দিয়ে গঠিত অথবা।

(খ) যষ্ঠী বিভক্তির ক্ষয়িত রূপ (রা, এরা, এদের) দিয়ে গঠিত। যেমন -

একবচন > বহুবচন

লোক, লোকগুলি, সমস্ত লোক, লোকেরা, লোকদের।

তবে হিন্দি, মারাঠী সিদ্ধিতে একবচন ও বহুবচন পৃথকরূপে আছে -

হিন্দি = লড়কা - লড়কে।

৩। **কারক:** নব্যভারতীয় আর্যে কারক প্রধানত দুটি -

মুখ্য কারক - কর্তা

তির্যক/গৌণ কারক - করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ (কর্মকারক আগেই কর্তা কারকের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।)

৪। **বিভক্তি:** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীন বিভক্তি গুলির অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। (মাত্র দু একটি বিভক্তির পরিবর্তিত রূপ বর্তমান আছে)। আর লোপপাওয়ার ক্ষেত্রে বিভক্তির অর্থ প্রকাশের জন্য নতুন নতুন প্রত্যয়গত শব্দ ও অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন -

বাংলায় - র, এর, আগে, কে। বাংলার লোক; ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার; তোমার আগে কহিল নিশ্চয়; জনকে চল।

হিন্দিতে - সে (< সম), কো(কৃত) - ঘর সে (ঘর থেকে)। রামকো (রামকে)।

৫। **ক্রিয়ার কাল ও ভাব:** নব্যভারতীয় আর্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মতো ক্রিয়ার পাঁচভাব ও পাঁচকাল নেই।

এখানে (ক) বর্তমান কাল নির্মিত হয়েছে কর্তৃবাচ্যে ও কর্মভাববাচ্যে।

(খ) অতীত কালের ক্রিয়াপদ সর্বত্রই ধ্বনিপরিবর্তন সাপেক্ষে 'ভ্র' প্রত্যয় থেকে উদ্ভূত।

(গ) ভবিষ্যৎ কালের পদ নিম্নলিখিত হয়েছে 'তব্য' অথবা 'শত্' প্রত্যয় যোগে। তবে পশ্চিম পঞ্জাবী ও গুজরাটিতে

ভবিষ্যৎ - কালের প্রাচীন রূপ বর্তমান আছে।

৬। **যৌগিক কাল:** নব্যভারতীয় আর্যে মধ্যস্তর থেকে একাধিক ধাতু মিশে যৌগিক কালের রূপ গঠিত হয়েছে। যেমন :

গত + √ভূ (√অস) > গয়া হৈ (হিন্দি)।

গত + √অস (<আছে) > গিয়াছে (বাংলা)।

৭। **শ্রুতিধ্বনি:** নব্যভারতীয় আর্যে য-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির প্রচলন ঘটেছে। যেমন :

য-শ্রুতি - দু-এক = দুয়েক, বাবুআনি = বাবুয়ানি।

ব-শ্রুতি - মো আ = মোয়া, (মোওয়া), শো আ > (শোওয়া)।

এর ফলে উচ্চারণ সৌকর্য বেড়েছে।

৮। **বিদেশী শব্দ গ্রহণ:** নব্যভারতীয় আর্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিদেশী শব্দ গ্রহণ। - আরবী, ফারসী, তুর্কী, পর্তুগীজ তো ছিলই, তার সঙ্গে মিশলো প্রচুর ইংরাজী শব্দ। এইভাবেই নব্যভারতীয় আর্যের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হলো।

৯। **বাক্যগঠন:** নব্যভারতীয় আর্যে বাক্যগঠনের বিচিত্র পদ্ধতি লক্ষ্য করা গেল। বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া কর্মবাচ্যের ব্যবহার বেশী রইলো না। প্রাচীন ভারতীয় আর্যে পদ অনুসারে পৃথক পৃথক বিভক্তি চিহ্ন বসতো। নব্যভারতীয় আর্যে বিভক্তি বিধি অনেক শিথিল হলো। অনেক সময় বিভক্তি বসলো না। ফলে কোনো বাক্যের কর্তা কর্ম নির্ণয়ে এখন জটিলতা সৃষ্টি হলো। শুধু বিভক্তি দিয়ে কর্তা কর্ম চেনা গেলো না।

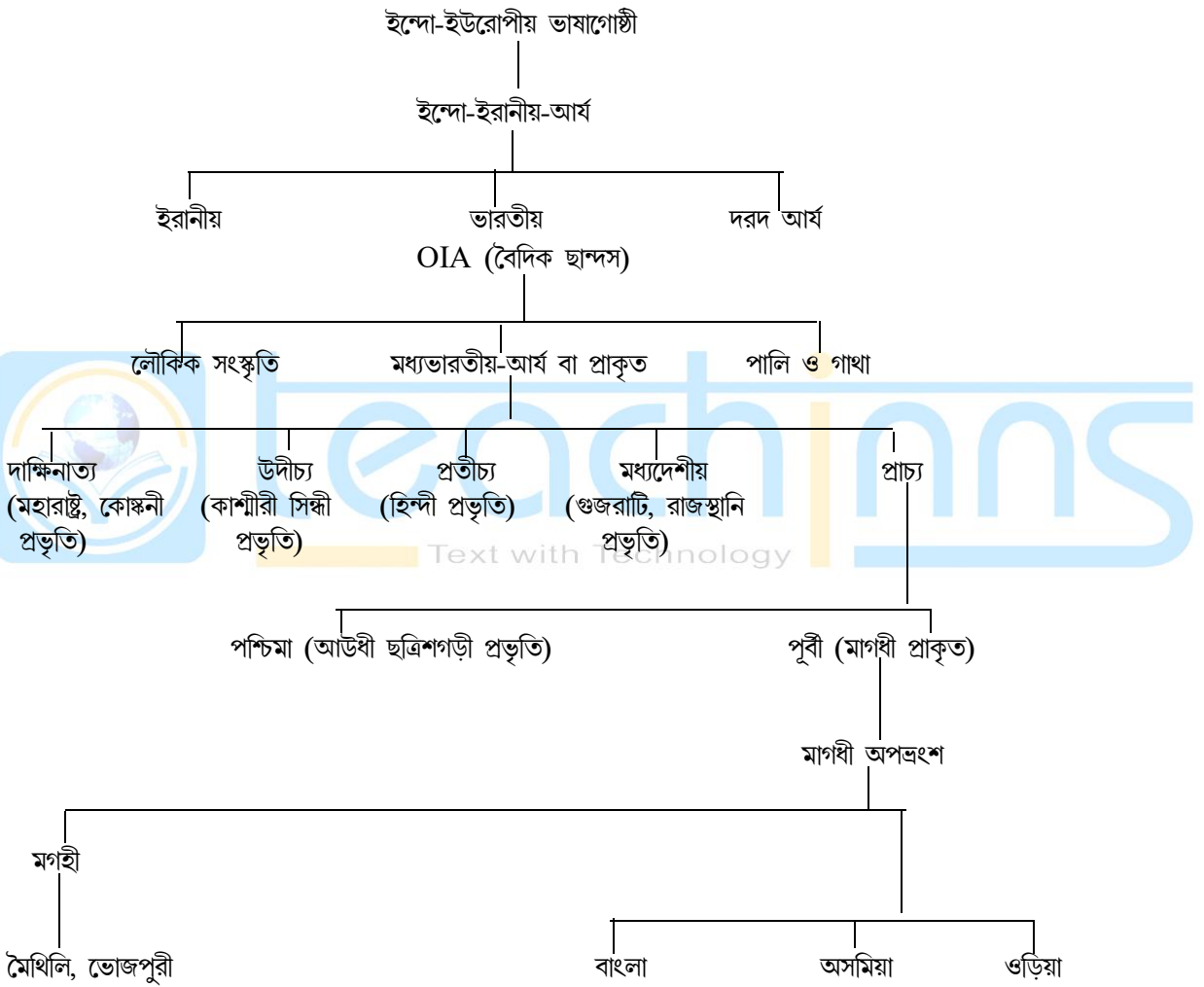
১০। **ছন্দ-বৈচিত্র্য:** নব্যভারতীয় আর্যে ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষণীয় হয়ে উঠলো। অন্যান্যপ্রাঙ্গণ এলো। পর্বে পর্বে, পদে পদে মিল এলো। ছন্দে মাত্রাবৃত্ত রীতি জাঁকিয়ে বসলো। 'গদ্য-ছন্দ' এলো। তা এসে অন্যান্যপ্রাঙ্গণ ছন্দকে স্তব্ধ করে দিলো। বাংলায় স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত - তিন রীতির ছন্দ। অমিত্রাক্ষর, গদ্যকবিতার ছন্দ, সনেট প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ দেখা গেলো।

Sub Unit - 2

১.২.১ বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস

বর্তমানে বাংলা ভাষার যে বর্তমান রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করি তা এক সময় প্রাচ্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্বে সেই অঞ্চলে মাগধী ভাষার একচ্ছত্র প্রভাব ছিল। আধুনিক বাংলা ভাষা মাগধী ভাষারই একটি বিশিষ্ট শাখা। অনেকে সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী বলেছেন। তা কতখানি সার্থক আলোচনার দাবি রাখে।

এই মাগধী ভাষার উৎস সন্ধান করলে দেখা যায় এটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারই একটি শাখা আদি-ভারতীয়-আর্যভাষা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে আধুনিক আর্য ভাষাগুলির জন্ম দেয়। তেমনি একটি ভাষা হল আমাদের বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষা হাজার বছর অতিক্রম করেছে, যদিও বংশ-কৌলিন্যে তা পৃথিবীর এক মহান ভাষা-পরিবারের উত্তরাধিকার বহন করেছে।



উপরোক্ত বাংলা ভাষার উৎস নির্ণায়ক চিত্র লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, বাংলা ভারতীয়-আর্য ভাষা রূপে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই বিবর্তনের স্পষ্ট তিনটি স্তর পাই -

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য : এই যদি ভারতীয় আর্যের পরিসর আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। এযুগের আর্যভাষার প্রচুর স্বরধ্বনি ছিল। শব্দ ও ধাতুরূপের বৈচিত্র্য ছিল। এমনকি যুক্তাক্ষরও প্রচুর ছিল। তাছাড়া সমাসের ব্যবহার ও পদবিন্যাসে স্বাধীন রীতিই বাংলা ভাষার বিবর্তনের পথকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

২. মধ্যভারতীয় আর্য : মধ্যভারতীয় আর্যের পরিজসর আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৯০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত। এ যুগের ভাষা ছিল মূলত মানুষের মুখে ব্যবহৃত বিকৃতরূপে। তা প্রাকৃত নামেই পরিচিত ছিল। প্রাকৃত ভাষা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল - প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, দাক্ষিণাত্য, মধ্যদেশীয়। এযুগের ভাষার মূল লক্ষণ স্বরধ্বনির সংখ্যা হ্রাস যুক্তব্যঞ্জনের সরলতা। এছাড়া ঋ, ঐ, ও এবং পদান্ত ব্যঞ্জন লুপ্ত হল। শ্ , স্ , ষ্ - এর জায়গায় প্রায়ই স্ বা শ্ ব্যবহার হতো। তৎকালীন সংস্কৃত নাটকে অন্ত্যজ শ্রেণির সংলাপে তার নিদর্শন মেলে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে ব্যবহৃত প্রাচ্য বিভাগের দুটি শাখার মধ্যে পূর্ব-প্রাচ্য হল মগধের ভাষা। তাই এর নাম মগধী।

৩. নব্যভারতীয় আর্য : নব্যভারতীয় আর্যের পরিসর আনুমানিক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। যুগধ্বনির সমতাপ্রাপ্তির প্রবণতা এবং তার ফলে হ্রস্ব-স্বরের দীর্ঘতা এযুগের ভাষার অন্যতম লক্ষণ। যেমন - কর্ম > কন্ম > কাম। এছাড়া পদমধ্যে সন্নিবৃত্ত স্বরধ্বনির সংহতি লক্ষ করা যায়। যেমন - কইহণ (অপভ্রংশ) > কৈহণ। ক্রিয়াপদের অসমাপিকাজাত অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সৃষ্টি ও যৌগিককালের ব্যবহার দেখা যায়।

এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মগধী অপভ্রংশ ধারার অন্যতম মুখ্য শাখা বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। তবে অধিকাংশ মনে করেন যে, সংস্কৃত থেকেই বাংলা তথা ভারতের অপর ভাষাগুলি জন্ম নিয়েছে। এই ভ্রান্ত ধারনার পিছনে রয়েছে সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য ও মহিমার প্রতি অবাস্তব উচ্চ ধারণা। কারন প্রথমত, সংস্কৃত ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ভারতে দ্রাবিড়, অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অনেক ভাষা (তামিল, তেলেগু, সাঁওতালী, খাসী, নিকোবরী প্রভৃতি) অনেকক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা থেকে ঋণ নিয়েছে, তা ছিল বাহ্যিক ঋণ। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সংস্কৃত ভাষা থেকে জন্মলাভ করেনি। দ্বিতীয়ত, মারাঠী, হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি সহ আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম উৎস ইন্দো-ইউরোপীয়-ভাষা গোষ্ঠী ; সংস্কৃত ভাষা নয়।

তবে একথা স্বীকার্য সংস্কৃত ভাষাতেই অসাধারণ সাহিত্য কীর্তি রচিত হয়েছিল। কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, বিশাখ দত্ত প্রমুখ কবি ও নাট্যকারদের হাতেই সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির প্রদান মাধ্যম হয়ে গিয়েছিল। তাই পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব বেশি মাত্রায় পড়ে। বাংলা শব্দভান্ডারের প্রায় ৮০ শতাংশ শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি বা বিবর্তিত আকারে গৃহীত। সুতরাং জন্মসূত্র বিচারে সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী বলা যায় না। তবে ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা যে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করেছে ও সমাদৃত হয়েছে, তার অন্তরালে সংস্কৃত ভাষার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।



Teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 3

১.৩.১ ভূমিকা : বাংলা ভাষার ইতিহাস :

১। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেছেন, বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে আনুমানিক ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে।

২। বাংলা ভাষার উৎস বা উৎপত্তিস্থল হলো ‘মাগধী- অপভ্রংশ-অবহট্ট’, কারো কারো মতে ‘আদর্শ কথ্য প্রাকৃত’। (এবং ‘সংস্কৃত থেকে নয়’)

৩। বাংলা ভাষার এখন বয়স প্রায় এক হাজার বছর- ৯০০ খ্রী: থেকে আজ পর্যন্ত এই একহাজার বছরে বাংলাভাষা নানাবিবর্তনের মধ্যদিয়ে নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

৪। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বাংলাভাষার এই হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাসকে প্রধান তিনটি স্তরে বা যুগে বিভক্ত করেছেন। যেগুলি হল:

ক) ‘প্রাচীন’ বা ‘আদি’ বাংলা, কালসীমা ৯০০-১৩৫০ খ্রী:

খ) মধ্য বাংলা- তার দুইভাগ

অ) ‘আদি মধ্য’ বাংলা, ১৩৫১-১৫০০ খ্রী:

আ) ‘অন্ত্যমধ্য’ বাংলা, ১৫০১-১৭৬০ খ্রী:

গ) আধুনিক বাংলা, কালসীমা ১৭৬১ খ্রী: থেকে আজ পর্যন্ত।

১. ‘প্রাচীন বাংলা’ (=আদি স্তর) ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা বিশিষ্ট লক্ষণ (Linguistic Features of Iod Bengali Language) :

চর্যাপদের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য

১) কালসীমা: প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমা হলো আনুমানিক ৯০০ খ্রী: থেকে ১২০০ খ্রী:। কেউ কেউ ১৩৫০ খ্রী: পর্যন্ত সময়কেও এই প্রাচীন বাংলার সর্বশেষ সীমা বলে মনে করেন।

২) প্রাচীন বাংলার নিদর্শন : ‘চর্যাপদ’

প্রাচীন বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন বৌদ্ধসহজ সাধকদের লেখা ‘চর্যাগীতি পদাবলীক’ বা ‘চর্যাপদ’। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে এটি আবিষ্কার করেন। নাম দেন- ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’। তাঁর সম্পাদিত ‘হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা’ গ্রন্থে তিনি ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’ প্রকাশ করেন। এগুলি যে বাংলা ভাষায় লেখা, তা প্রমাণ করেন। এগুলি যে বাংলা ভাষায় লেখা, তা প্রমাণ করেন ভট্টাচার্য ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

[এছাড়া আরো কিছু গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা শব্দের বা দু একটি ছড়ার নিদর্শন আছে। এগুলি হলো-

ক) বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের- ‘বিদগ্ধমুখমন্ডণ’

খ) বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বানন্দের অমরকোষের ‘টীকাসর্বস্ব’।

গ) ‘সেখশুভোদয়া’]

৩) প্রাচীন বাংলাভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য:

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১। প্রাচীন বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো পূর্বস্তরের যুগ্ম ব্যঞ্জননের একক ব্যঞ্জনে পরিনতি এবং সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী হ্রস্ব স্বরের দীর্ঘীকরণ।

সংস্কৃতে যা ছিলো যুক্তব্যঞ্জন (‘কার্ঘ’), প্রাকৃতে তা ই হলো যুগ্ম ব্যঞ্জন (কজ্জ), বাংলা ভাষার আদিস্তর চর্যাপদে তাই হয়েছে একক ব্যঞ্জন (কাজ)- আর ক্ষতিপূরন বা পরিপূরক হিসেবে পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বরটি দীর্ঘস্বর হয়েছে। তাই কজ্জ-‘কজ’ না হয়ে হয়েছে কাজ। তেমনি: জন্ম > জন্ম > জাম।

অবশ্য এর অনেক ব্যতিক্রমও আছে।

২। প্রাচীন বাংলা চর্যাপদে পদের অন্ত:স্থিত স্বরধ্বনি বর্তমান ছিল। যেমন -

ভগতি > ভনই। পুস্তিকা > পোথিকা > পোথী। উথিত > উটটিঅ > উঠি।

৩। প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক স্বরধ্বনি আছে, কিন্তু দুটি মিলেমিশে (সন্ধি করে) একটি স্বরে পরিনত হয়নি। যেমন: উদাস > উআস। এখানে উ, আ দুটি স্বরধ্বনি সন্ধিবদ্ধ হয়নি, পৃথক পৃথক আছে।

- ৪। প্রাচীন বাংলা ভাষায় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির মাঝে শ্রুতিধ্বনি হিসাবে ‘য়’, ‘ব’ ধ্বনি এসে গেছে। যেমন -
‘য়’ আগম= নিকটে > নিঅডি > নিয়ডি
‘ব’ আগম= ত্রিভুবন > তিহুন > তিহুন। কবডি। আবই।
- ৫। প্রাচীন বাংলায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণধ্বনি সাধারণত ‘হ’ করে পরিনত হয়েছে। যেমন:
মহাসুখ > মহাসুহ। কখন > কহন।
- ৬। প্রাচীন বাংলা ভাষায় দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন লোপের প্রচুর উদাহরণ আছে। যেমন :
সকল > সঅল। সরোবর > সরোঅর।
- ৭। প্রাচীন বাংলায় নাসিক্য-ব্যঞ্জন ধ্বনি কখনো কখনো লোপ হয়েছে। এবং অবলুপ্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিকা হয়েছে। যেমন : মধ্যেন > মাঝে। শব্দেন > সাঁদে।
- ৮। প্রাচীন বাংলায় উচ্চারণে বা ব্যবহারে ‘ন’ এবং ‘ণ’ এর মধ্যে পার্থক্য ছিল না। তাই একই শব্দের বানানে কোথাও ‘ন’ কোথাও ‘ণ’। যেমন: নাবী > গাবী, নিয় > গিব।
- ৯। প্রাচীন বাংলা ভাষায় শ,ষ,স এই তিন শিষ্ ধ্বনির উচ্চারণে বা ব্যবহারে পার্থক্য ছিল না। তাই একই শব্দের বানানে কোথাও ‘শ’, কোথাও ‘স’। আবার কোথাও কোথাও ‘স’, ‘ষ’ হয়েছে। যেমন:
শূন - সুন, শবরী - সবরী, মুষা - মুসা, সহজে - ষহজে।
- ১০। প্রাচীন বাংলায় ‘য’ ধ্বনি উচ্চারণে বা ব্যবহারে ‘জ’ ধ্বনিতে পরিনত হয়েছিল। তাই চর্যাপদের বানানে কোথাও ‘য’ নেই। যেমন- জে জে আইলা। জো মনগোঅর। জেনা। জসু
- ১১। প্রাচীন বাংলায় আদি স্বরে শ্বাসাঘাত পড়েছে। আর তারই ফলে শব্দের আদি স্বরটি অনেকসময় দীর্ঘস্বরে পরিণত হয়েছে। যেমন: ‘আলো ডোষী’। আকট (অকট)।

(২) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

- ১। প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপান্তরগত একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, নাম পদে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ‘র’ বা ‘এর’ ব্যবহার। এই বৈশিষ্ট্যটি একমাত্র বাংলা ভাষাতেই মেলে। যেমন : রুখের তেস্তুলি। হরিনার খুর ন দীসঅ। ঢেনঢন পা এর গীতা।
- ২। প্রাচীন বাংলা ভাষায় কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি হয়- এখনকার বাংলার মতোই। যেমন : বলদ বিআএলা। পইঠো কাল। চলিল কাহ। লুই ভণই। হরিনা পিবই ন পানী।
- ৩। প্রাচীন বাংলায় করণকারকে ‘তে’, ‘তেঁ’ বিভক্তি বর্তমান। এটিও বাংলা ভাষার একটি নিজস্ব লক্ষণ। যেমন : সুখ দুখেতে নিচিত মরিঅই।
- ৪। প্রাচীন বাংলায় অধিকরন কারকে ‘ত’ বিভক্তির প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এটিও বাংলার নিজস্ব বিভক্তি। এছাড়া অধিকরনে ‘ই’, ‘এ’, ‘হি’, ‘তেঁ’ প্রভৃতি বিভক্তিও আছে। যেমন :
সামকমত চড়িলে। টালত ঘর মোর। মাঙ্গত চড়হিলে
হাঁড়িত ভাত নাহি। চঞ্চল চীএ। হিঅহি ন পইসই। জামে কাম। কামে জাম।
- ৫। প্রাচীন বাংলা চর্যাপদের ভাষায় সম্বন্ধে ‘র’, ‘এর’, ‘ক’ বিভক্তি হয়েছে। এটিও বাংলা ভাষায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন :
মোহোর বিগোআ। রুখের তেস্তুলি। এড়িএউ ছান্দক বান্দ।
- ৭। প্রাচীন বাংলায় সমাপিকা ও অসমাপিকা এই দুই ক্রিয়াই ছিল। সমাপিকা ক্রিয়ায় অতীতকাল বোঝাতে ‘ইল’ এবং ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে ‘ইব’ প্রত্যয় যুক্ত হতো।
যেমন : ইল- দেখিল, আইল, রুক্ষেলা, গেলা, ভইলা।
ইব- হোইব, জাইবে, করিব।
- ৮। প্রাচীন বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ারও প্রচুর উদাহরণ মেলে। ‘ইলে’ বা ‘অন্তে’ প্রত্যয় যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন : ইলে- সাক্ষমত চড়িলে। রাতি ভইলে।
অন্তে- জাগন্তে সুখাডী।
এছাড়াও নানা অসমাপিকার উদাহরণ হলো:
দিআঁ চঞ্চলী। কঠে লইআ। কঁহি গই। দিঢ করিআ। আঁখি বুজিআ। অপনে বহিআ।
- ৯। প্রাচীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের বহুবচন পদগুলি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:
সং অস্মাভি: > প্রা অমহাহি > অপ. অমহহি > প্রা। বাং অমহে, আমহে।
এই বহুবচন পদটি একবচন ‘আমি’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে: ভণই লুই আমহে ঝাণে দিঠা।
তেমনি- তুস্মাভি: (যুস্মাভি:) > তুমহাহি > তুমহহি > তুমহে।
- ১০। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার খুব উল্লেখযোগ্য। যেমন: গুনিয়া লেহঁ। দুহিল দুধু। দিঢ করিআ। উঠি গেলা।
- ১১। প্রাচীন বাংলা ভাষায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে কর্ম বা ভাববাচ্যের বহুল ব্যবহার আছে। যেমন: রাতি পোহাইলী। খুর ন দীসঅ। বাট জাইউ।

- ১২। প্রাচীন বাংলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শব্দদ্বিত্ব। যেমন: উচা উচা পাবত। কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।
জে জে আইলা তে তে গেলা।
- ১৩। প্রাচীন বাংলা ভাষায় যেমন সংখ্যা বাচক বিশেষণ ছিল, তেমনি বহুত্ব বোধক বিশেষণও ছিল। যেমন:
সংখ্যাবাচক = পঞ্চবি ডাল। বতিস জৈইনী। তিশরন নাবী। চৌষঠী কোটা।
বহুত্ববোধক = সকল সমাহিআ। জৈইনী জাল।
- ১৪। প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে অনেক গুলি প্রবাদ প্রবচন আছে। যেগুলিকে বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য বলে বিবেচনা করা হয়।
যেমন: ক) অপনা মাঁসে হরিণা বৈরি। ঘ) দুহিল দুখু কি বেণ্টে যামাঅ
খ) হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী ঙ) জো যো চৌর সোই সাধী
গ) জো সো বুধী সোধ নিবুধী চ) বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ

১.৩.২.

মধ্যবাংলা (১৩৫১-১৭৬০) আদি-মধ্যবাংলা (১৩৫১-১৫০০)

ভূমিকা:

পন্ডিতদের মতে, বাংলা ভাষার জন্ম ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রী:। তারপর আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে, নানাভাবে বাংলা ভাষা বিবর্তিত হচ্ছে। এই সুদীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসকে ভাষাতাত্ত্বিকেরা তিনটি প্রধান যুগে বা স্তরে বিভক্ত করেছেন:

ক. ‘আদিস্তর’ বা ‘প্রাচীন বাংলা’। নিদর্শন ‘চর্যাপদ’। স্থিতি কাল ৯০০-১৩৫০ খ্রী:

খ. ‘মধ্যস্তর’ বা ‘মধ্যবাংলা’। স্থিতিকাল ১৩৫১-১৭৬০ খ্রী:

গ. ‘আধুনিক স্তর’ বা ‘আধুনিক বাংলা’। স্থিতিকাল ১৭৬১ খ্রী: থেকে আজ পর্যন্ত

তন্মধ্যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়- ‘মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ’। পন্ডিতদের মতে, মধ্যবাংলার কালসীমা ১৩৫১ খ্রী: থেকে ১৭৬০ খ্রী:। অর্থাৎ প্রায় চারশো বছর। যেহেতু ভাষা পরিবর্তনশীল এবং নদীর মতো খাত পরিবর্তনকারী, তাই সূক্ষ্ম বিচারে এই মধ্যবাংলার দুটি উপবিভাগ বা উপস্তর আছে।

অ) ‘আদিমধ্য’ (স্থিতিকাল = ১৩৫১-১৫০০ খ্রী:)

আ) ‘অন্ত্যমধ্য’ (স্থিতিকাল = ১৫০১-১৭৬০ খ্রী:)

২. ‘আদি-মধ্য’ বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ

(Linguistic Features of Early Middle Bengali Language)

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার বৈশিষ্ট্য)

১) কালসীমা:

‘আদি-মধ্য’ স্তরের বাংলা ভাষার কালসীমা আনুমানিক ১৩৫১ খ্রী: থেকে ১৫০০ খ্রী:।

২) নিদর্শন : - (প্রামাণিক)

আদি-মধ্য যুগের (উপস্তর) বাংলা ভাষার একটি মাত্র প্রামাণিক নিদর্শন মিলেছে: বড়ুচড়ীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। বসন্তরঞ্জন রায় তা ১৩১৬ বঙ্গাব্দে আবিষ্কার করেন। এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তা প্রকাশ করেন।

অন্য নিদর্শন (কল্পিত)

কেউ কেউ মনে করেন নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি ও এই আদি-মধ্য উপস্তরের রচনা। এগুলি হলো - ক) মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’, খ) কৃষ্ণিবাসের ‘শ্রীরামপাচালী’, গ) বিপ্রদাসের ‘মনসাবিজয়’, ঘ) নারায়ণদেবের ‘মনসামঙ্গল’, ঙ) বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’। কিন্তু এগুলির ভাষা বার বার এত পরিবর্তিত হয়েছে যে, এগুলিতে ‘আদি-মধ্য’ যুগের বাংলা ভাষার ছিটেফোঁটা নিদর্শনও পরিলক্ষিত হয়নি। তাই পন্ডিতেরা এগুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে একমাত্র ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’র ভাষার উপর নির্ভর করেই ‘আদি-মধ্য’ বাংলা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দেশ করেছেন। কারন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে মূলে হস্তক্ষেপ বেশি হয়নি এবং একমাত্র এতেই সেকালের ভাষা সুরক্ষিত হয়েছে। ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. সুকুমার সেন এ বিষয়ের প্রথম প্রবক্তা। পরবর্তীকালে তাঁদের পথই ভাষাতাত্ত্বিকেরা অনুসরণ করেছেন। আমরাও সেই নির্দেশিত পথেই ‘আদি-মধ্য’ বাংলা স্তরের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছি:

১. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

- ১। আদি-মধ্য বাংলাভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য- আ-কারের পরে ই-কার বা উ-কার থাকলে তা ক্ষীণ হয়। যেমন :
আউলাইল। আইহন। গাইল। মাইলৌ। বড়ায়ি।
(এখানে ক্ষীণ হয়েছে- উ,ই,ই,ই। বড়ায়ির উচ্চারণ হয়েছে = বড়াই)
- ২। আদি-মধ্য বাংলার আ-কারের পরে পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে, সে-দুটি মিলিয়ে যৌগিক-স্বরের সৃষ্টি হয়। যেমন :
আ এ (বাএ, রাএ)। আই (গাইল, নাইল), আও (জাও, লুকাও)।
- ৩। আদি-মধ্য বাংলার আর একটি বৈশিষ্ট্য-নাসিক্য ব্যঞ্জন (ঙ, ঞ, ণ, ন,ম) যোগে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সরলীকরণ। যেমন:
কান্তি > কাঁতি। বাম্প > বাপ।
(তবে এর ব্যতিক্রমও প্রচুর-কান্দ/কুন্ডার/আক্ষি)
- ৪। আদি-মধ্য যুগে বাংলা ভাষার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য-মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণ লোপ অথবা ক্ষীণতা। যেমন :
কাহ > কানু। বুঢ় > বুঢ়। আক্ষি > আমি।
- ৫। আদি-মধ্য বাংলার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য লক্ষণ - অল্পপ্রাণ ধ্বনির পরে ‘হ’ ধ্বনি থাকলে ঐ অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণে পরিনত হয়। যেমন-
একহৌ > একৌ। কবহৌ > কভৌ। কতহৌ > কথৌ
- ৬। আদি-মধ্য যুগের বাংলা ভাষায়-ই কার অনেকসময় উ-কারে পরিণত হয়েছে। যেমন :
দ্বিগুন > দুগুন। দ্বিচারিনী > দুচারিনী।
- ৭। এই যুগের বাংলায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থেই) প্রথম শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসঘাত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তার ফলে হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়েছে। যেমন : আয়র (অপর)। আতিশয় (অতিশয়)। আন্ধারী (অন্ধকার)। আখান্তর (অবস্থানান্তর)। আমান (অমান্য)। আইহন (অভিমন্যু)। আভিসার/আনল/আসুখ। আবরা। আধিক/আমৃত/আবাগী।
- ৮। এই যুগের ভাষায়, যত্রতত্র আনুনাসিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগে ঘটেছে।
যেমন : শবদে/হআঁ/মৌ/কৈলৌ/হারায়িলৌ/করিতে।
নহৌ/জাও/পসিও/লুকাও/আউলাইলৌ।
বংশীখন্ডের ‘কে না বাঁশ’ পদে এই ১১ টি আনুনাসিক শব্দ আছে।
- ৯। এই যুগের গ্রন্থ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র বানানে নিম্নলিখিত ধ্বনিগুলির পার্থক্য রক্ষিত হয়নি।
১) ই,ঈ = আখি/আখী। দুতি/দুতী। সিতল/সিশের।সিত।
২) উ,ঊ = উজল/উজলা। তিনাচুরী।আনুমতী।ছাড়ী।হাটী।বাক।জাউ।জাউ।
৩) ণ,ন = মণ/মন।পুনী/পুনী।কেমনে/কেমনে। পানী/পানী। গাল/নাল।
৪) শ,ষ,স= শীতার/শলিল, যেষ/সস্যা। সশুর/সীতল/সিশের।
৫) য,জ= জাএ/যাএ। জাও/যাও। জাই/যাই। জাইবে/যাইবে। জান/যান। যত/জত।
৬) য,অ = খঅ (ক্ষয়)।
সুতরাং মনেকরি সেকালের উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রভেদ ছিল না। তাই বানানে, এদের নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়েছে।
- ১০। আদি-মধ্য যুগের ভাষায়, শব্দের আদিস্থিত উ-কার ও-কারে (উ > ও) এবং ও-কার, উ-কারে (ও > উ) পরিনত হয়েছে। যেমন :
উ > ও = গুপতে > গোপতা। বুলে > বোলে। তুলি > তেলী।
ও > উ = গোআলী > গুয়ালী।
- ১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি সুপরিচিত রূপ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন:
ক) স্বরভক্তি/বিপ্রকর্ষ : বারিষা (বর্ষা)। বেআকুল (ব্যাকুল)। গেআন (জ্ঞান)। তরাসে (ত্রাসে)। মুগধী (মুগ্ধ-স্ত্রীলিঙ্গে)। পুরুবে (পূর্বে)। আরতি (আর্তি)। শকতি (শক্তি)।
খ) স্বরসঙ্গতি : রহিলী (রহিল)। অনিপামা (অনুপম)। তোম্মারা (তোম্মার)। বিকলি (বিকল)।
গ) ধ্বনি লোপ : যুক্ত ব্যঞ্জনের একটি ব্যঞ্জন লোপ- দুলভ (দুলভ)। সামী (স্বামী)। তন (স্তন)। আখর (অক্ষর)।
ঘ) ধ্বন্যাগম : নতুন ধ্বনির সংযোগে অযুক্তবর্ণ যুক্তবর্ণে রূপ পেয়েছে। ছিড়িআঁ (আগম=ণ), আক্ষ্মারে (আগম=হ), গাষি (আগম=ব)।
ঙ) মিশ্রণ: খরল = খর + গরল, গহীন = গহন + গভীর।

২. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

- ১) আদি-মধ্যযুগের বাংলা (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের) ভাষার একটি রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো-কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি - (এটি চর্যাতেও ছিল-আজও আছে)।
যেমন : কাক কাড়ে রাএ। তেলি আগে আএ। আন্তর পোড়এ এবৌ।

গাইল বড় চন্ডীদাস বাসলীবর। চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে।

২) এই যুগের ভাষায় গৌণকর্ম ও সম্প্রদানকারকে ‘ক’, ‘কে’, ‘রে’ বিভক্তি মিলে। যেমন:

ক = হান পাঁচবান তাক না কবিহ দয়া

কে = কংসকে বুলিল কন্যা; কাহ্নাঐকে বোল সে আপনেম।

রে = সাপেরে করিআঁ বিষদানে।

৩) এই যুগের ভাষায় করণ কারকে ‘ত’, ‘এ’, ‘ঐ’, বিভক্তি বর্তমান।

যেমন : ত = হাথত ধিরআঁ মোর দগধপরানে।

এ = মিছাই মাথাএ পাড়এ সান।

ঐ = নিজ মাগেঁ হরিনী জগতের বৈরী।

৪) আদি-মধ্যযুগের ভাষায় সম্বন্ধ পদের ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ‘র’, ‘এর’, ‘ক’, ‘কের’।

যেমন : র = ভাঁগিল সোনার গট যুড়ীবাক পারি

এর = উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারি

কের = তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহু নদীকের বানে।

৫) আদিমধ্য যুগের গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অপাদানকারকে ‘ত’, ‘তে’, ‘তেঁ’ বিভক্তি লক্ষণীয়।

যেমন : অ = আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলৌ মনে,

মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহী

তে = জলতে উঠিলী রাহী।

৬) এযুগের ভাষায় অধিকরণে ‘এ’, ‘ত’, ‘তে’, ‘তঁ’ ইত্যাদি সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন মিলেছে।

যেমন : এ = পথে মাহাদানী থুইলা; বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঐর দান বটে।

অ = সেজাত সুতিআঁ; বাটত সুজিআঁ দান।

তে = সিসতে সিন্দুর।

৭) এ যুগের ভাষায় কর্তৃকারক ছাড়া অন্য কিছু কারকেও বিভক্তিহীনতার সন্ধান মেলে।

যেমন : কর্ম- ধল কাল দুই কেশ দিল নারায়নে। চতুর্দিশ চাহৌ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।

অধিকরন- তবৈঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী

করন- বাড়ই সো তরু সুভাসুভ পানী

৮) আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষাতে সর্বনামের কর্তৃকারকে বহুবচন সৃষ্টি হয়েছে ‘রা’ বিভক্তি যোগে।

যেমন : তোক্ষারা, আক্ষারা, তারা। পুছীল তোক্ষারা কেহে তরসিলা মনে।

আজি হৈতেঁ আক্ষারা হৈলাহৌ একমতী।

৯) এ যুগের ভাষায় তির্যক কারকের অর্থে নানান অনুসর্গের ব্যবহার ঘটেছে।

যেমন : আন্তর-তোক্ষার আন্তরৈঁ গেলৌ রাধিকার থানে।

মাঝেঃ- বনমাঝেঁ পাইল তরাসে।

সমে- তবৈঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে।

পানে- মোর পানে চাহে যত লোক জাএ হাটে।

ঠাই- কেহে হেন মিছা কথা কহ মোর ঠাই।

কারন- কংসের কারনে হএ সৃষ্টির বিনাশে।

১০) এ যুগের গ্রন্থ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ বচন নিম্পন্ন হয়েছে দুই ভাবে :

ক) প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ‘গন’, ‘সব’, ‘জন’, ‘রা’, ‘এরা’ যোগ করে -

যেমন : দেবগন, গোপীজন, সব সখি, আক্ষারা/তোক্ষারা/তারা।

খ) অপ্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে শুধু ‘গন’ যোগ করে -

যেমন : প্রমানগন, বাদ্যগন, আভরনগন।

১১) আদি- মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় ধাতুর সঙ্গে ‘ই’, ‘ইআঁ’, ‘ইতেঁ’, ‘ইলে’, ‘ক’ যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত

হয়েছে। যেমন: ই- উড়ি পড়ি জাওঁ।

ইআঁ- পশিআঁ লুকাওঁ।

ইতেঁ-তুলিতেঁ পানি।

ইলে- বুইলে মধুর বানী।

ক-করিবাক পারে।

১২। এ যুগের ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে ‘আছ’ ধাতু যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে।

যেমন : রহিলছে-রহিল+আছে; লইছে-লই+আছে। ফুটিলছে, আনিছিল।

এছাড়াও আমরা আরও তিনটি যৌগিক ক্রিয়ার উল্লেখ করছি -

চলি গেলি রাখিকা হরিষে। চাহিনেহ কাহুঞিঁ বাঁশি। রাখা চলি জাএল।

১৩। এ যুগের ভাষায় উত্তম পুরুষে অতীত কালে ‘লৌ’, ‘ইল’; বর্তমান কালে ‘ওঁ’, ‘ই’, এবং ভবিষ্যৎ কালে ‘ইব’ যোগ হয়েছে। যেমন :

অতীত- চিন্তিলৌ। আনিলৌ। ছাড়িলৌ মো মহাদান। আরতিল-আরতিল কাক। আখায়িল। পাকিল।

বর্তমান-তুলী লৈলৌ। দহে পইসওঁ। দেখিতে না পাওঁ। আমহে করি। শুনি।

ভবিষ্যৎ- করিব। জাইব। পেলাইবৌ।

১৪। এ যুগের ভাষায় ‘যা’ ও ‘ভূ’ ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাব বাচ্যের প্রচলন ছিল।

যেমন : ততেকে সুখাল গেল মোর মহাদানে

১৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাম-ধাতুর যথেষ্ট ব্যবহার ঘটেছে।

যেমন : হেন মনে পড়িহাসে। এবঁ তাক উপেখহ কেহে।

৩. ছন্দ বৈশিষ্ট্য:

ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় ছন্দ-বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। এই যুগের গ্রন্থ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ প্রথম অক্ষরবৃত্ত রীতির (তান প্রধান) পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে। পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদী, একাবলী এবং মহাপয়ার জাতীয় ছন্দ-বন্ধ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। যেমন :

পয়ার- পাখি নহৌ তার ঠাই | উড়ি পড়ি জাঁও ৮+৬=১৪ মাত্রা

ত্রিপদী- চান্দ সুরজের ভেদ না জানো

চন্দন শরীর তাএ

৬+৬+৮=২০ মাত্রা

অন্ত্য মধ্য বাংলা ভাষার ঋনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (Linguistic Features of Late-Middle-Bengali-Language)

১) কালসীমা :

অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার কালসীমা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন- ১৫০১ খ্রী: থেকে ১৭৬০ খ্রী:। তবে ড.সুকুমার সেন বলেছেন- শুধু ভাষার পরিবর্তনের কথা মনে রাখলে এর স্থিতিকাল ১৫০১ থেকে ১৭৫০ খ্রী: আর সেই সঙ্গে সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে এর স্থিতিকাল ধরতে হয় ১৫০১ খ্রী: থেকে ১৮০০ খ্রী:।

২) নির্দশন :

অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষায় সাহিত্যিক নির্দশন প্রচুর। তার সৎক্ষিপ্ত তালিকা হলো :

- ক) বৈষ্ণবপদাবলী : জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রমুখের পদাবলী
- খ) বৈষ্ণব (চৈতন্য) জীবনী : চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি
- গ) মঙ্গলকাব্য : মুকুন্দ চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখের গ্রন্থ
- ঘ) অনুবাদ কাব্য : কালীরামদাস প্রমুখের গ্রন্থ
- ঙ) মুসলমানী সাহিত্য : দৌলত কাজী ও আলাওলের গ্রন্থ
- চ) শাক্তপদাবলী : রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রমুখের রচনা।

এইসব অসংখ্য রচনা থেকে অন্ত্যমধ্য বাংলা ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। আর তা থেকেই ভাষাতাত্ত্বিকেরা এই উপস্তরের বাংলা ভাষার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ণয় করেছেন :

৩. ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১। ঋনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১) অন্ত্য-মধ্য উপস্তরের বাংলা ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য- পদান্তস্থিত একক ব্যঞ্জনের পরে অবস্থিত ‘অ’ কারের লোপ।

যেমন :-

প্রান্ ছনছন্ করে আমার্ মন্ ছনছন্ করে।

একলা ঘরে রেতে নারি কিসের্ যেন জ্বরে

কিন্তু যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে এই লোপ ঘটে নি। যথা :

যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।

- ২) অন্ত্য- মধ্য স্তরের ভাষায় আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়েছে ও তার ফলে মধ্য স্বরের লোপ ঘটেছে।
যেমন : হলদি-(হলদি বরন গোরাচাঁদ পড়া গেল মনে); অমনি, গাম্ছা, পাগলা। (=শ্বাসাঘাতের চিহ্ন)
- ৩) এই যুগে অপিনিহিতি ও বিপর্যাস ছিল। তারই ফলে ‘ই’ এবং ‘উ’ অনেকসময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে বসেছে- কখনো ‘উ’ ‘ই’ তে পরিবর্তিত হয়েছে- কখনো ব্যঞ্জনের পূর্বে বসা ‘ই’ বা ‘উ’ লোপ পেয়েছে।
যেমন : মাণ্ড > মাউগ > মাগ [ম্+আ+গ্+উ-ম্+আ+উ+গ্ > ম্+আ+গ্]
ফল্গু > ফাণ্ড > ফাউগ > ফাগ
কালি > কাইল > কাল [ক্+আ+ল্+ই-ক্+আ+ই+ল্ > ক্+আ+ল্]
এই উদাহরন গুলিতে স্পষ্টতই দেখছি ‘ই’ বা ‘উ’ ব্যঞ্জনের পূর্বে বসেছে, কিন্তু ‘ই’ বা ‘উ’ লোপ পেয়েছে।
- ৪) এই যুগের ভাষায় অভিশ্রুতির নিদর্শনও মেলে।
যেমন : পাতিয়া > পাইতা > পাত্যা, পেতে
খাইয়া > খায়া > খায়া, খেয়ে
বানিয়া > বাইন্যা > বেনে
- ৫) এই যুগে সাধু ও চলিত ভাষায় ‘নহ’, মহ এবং ঢ কার যুক্ত নাসিক্যধ্বনির মহাপ্রানতা লোপ পেয়েছে।
যেমন: বুঢ় > বুড়া কাহু > কান। আক্ষ্মার > আমার
- ৬) অন্ত্যমধ্যযুগে শ্রুতিধ্বনি (‘য়’, ‘ব’ এবং ‘হ’) এর প্রাবল্য এযুগের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।
যেমন : ছাওআল > ছাওয়াল। বাএ > বাহে
- ৭) এ যুগের ভাষায় প্রচুর অর্ধতৎসম শব্দ পাওয়া যায়।
যেমন : ব্যবহার > ব্যাভার। ক্ষমা > খেমা। ভৎসন > ভর্জন।

২. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

- ১। অন্ত্যমধ্য যুগের বাংলা ভাষায় একটি প্রধান রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হলো-সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘রা’ বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। যেমন- বন্দ্য বংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল। যুবতীরা কয়।
- ২। নির্দেশক বহুবচনে ‘গুলি’ ‘গুল’ এবং তির্যক কারকের বহু বচনে ‘দি’, ‘দিগ’ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন :
কি কারনে দেবসভা বল এতগুলি
মুন্নার সমান দন্ত গুল।
তাহা দিগে ধরিআঁ আনহ মোর ঠাই।
- ৩। এই যুগে নাম-ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার ছিল-তৎসম শব্দও নাম রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।
যেমন : শান্তাইব। লাখাইয়া। আগুসরি। বাখানিয়াছে।
- ৪। এই যুগের ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচুর।
যেমন : পিয়ে (পান করে)। পুছে (জিজ্ঞাসাকরে)। জিনে (জয়করে)।
- ৫। এই যুগের ভাষায় নিম্নলিখিতভাবে কারক ও বিভক্তি চিহ্নিত হয়েছে :
- | | | | |
|-------------|-----------------|---|----------------------------------|
| কর্তৃকারক | : শূন্য বিভক্তি | - | প্রনমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে। |
| কর্তৃকারক | : এ বিভক্তি | - | এক এক মাঝিকে কিলায় তিন জনে |
| কর্মকারক | : কে বিভক্তি | - | বীরকে লাগিল ব্যাথা |
| করন কারক | : এ, তে বিভক্তি | - | মায়াতে মোহিত সব |
| অপাদান কারক | : ত বিভক্তি | - | দূরত দেখিলে পুড়ে মন |
| অপাদান কারক | : কে বিভক্তি | - | ইহাকে অধিক তুমি জানিও তাঁহার |
- সম্বন্ধপদে : ‘র’, ‘ক’, ‘কর’, ‘কার’, ‘কের’ প্রভৃতি বিভক্তি মেলে-জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল।
অধিকরন : ‘এ’, ‘তে’, ‘রে’, ‘কে’ বিভক্তি-
তোমার কুটীরে হৈল মোর দরশনে
সেউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে। ‘এথাকে আনহ’।
- ৬। এযুগেও ‘ইল’ দিয়ে অতীত কাল এবং ‘ইব’ দিয়ে ভবিষ্যত কাল গঠিত হয়েছে।
যেমন : অতীত : করিল, পূজিল, জানিল, ছাড়িল
ভবিষ্যত : থাকিবে, পারিবে, মাখিবে, রাখিবে, বাড়িবে, ছাড়িবে।

১.৩.৩ আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) ভূমিকা :

ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভদ দশম শতাব্দীতে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষা নানাভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। এই হাজার বছরের ইতিহাসকে পন্ডিতেরা তিনটি যুগে বা স্তরে বিন্যস্ত করেছেন :

ক. আদিমের বা প্রাচীন বাংলা (৯০০- ১৩৫০খ্রীঃ)

খ. মধ্যমের বা মধ্য বাংলা (১৩৫১- ১৭৬০/ ১৮০০ খ্রীঃ)

গ. আধুনিক স্তর বা আধুনিক বাংলা (১৭৬১- ১৮০১ থেকে আজ পর্যন্ত)।

তন্মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

২) কালসীমা :

ড. সুকুমার সেন বলেছেন, ‘অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে হইতে বাংলার আধুনিক স্তরের আরম্ভ’। তবে কেউ কেউ ভারতচন্দ্রের

মৃত্যু সাল ১৭৬০ খ্রীঃ থেকেই এর সূচনা ধরতে চান। সম্প্রতি স্থির হয়েছে, আধুনিক বাংলার সূচনা ও বিস্তৃতি কাল হলো- অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আজ পর্যন্ত।

৩) নিদর্শন :

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় ও ভাবের বিচারে সর্বতোমুখী প্রসার লাভ করেছে। সেগুলি হলো :

ক) কাব্য-কবিতা (মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য-গীতিকাব্য) - মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, যতীন্দ্রনাথ, নজরুল, অমিয়, বিষু, সুনীল।

খ) গদ্যরচনা - উপন্যাস - বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, তারাশঙ্কর, মানিক, মহাশ্বেতা
- নাটক - মধুসূদন, গিরিশ, রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, বিজন, শম্ভু
- ছোট গল্প - রবীন্দ্র-প্রভাত-শরৎ-মানিক-সুনীল, স্বপ্নময় চক্রবর্তী।
- প্রবন্ধ - বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শ্রীকুমার, সুবোধ, সুকুমার সেন, ক্ষুদীরাম দাস।
- জীবনী - রবীন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার।

৪) আধুনিক বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

আধুনিক বাংলা ভাষার তিনটি প্রধান প্রবণতা লক্ষ্য করবার মতো -

১. লেখ্যভাষা ও কথ্যভাষার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য
২. লেখ্যভাষায় কবিতা রচনার পাশে গদ্য বিবিধ রচনার বিকাশ।
৩. ইংরেজী শব্দের প্রচুর ব্যবহার

প্রধানত গদ্যরীতিএ দুটো রূপ গড়ে উঠেছে-

ক) সাধুরীতি

খ) চলিতরীতি (কথ্যরীতি)

সাধুরীতিতে দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য লেখা চলছিল। উনিশ শতকে সাধুরীতি পরিপুষ্ট লাভ করে। পরবর্তীকালে চলিত গদ্যের ধারাটি সাহিত্য রচনার বাহন হয়ে উঠে। তাই এই যুগের ভাষার আলোচনায় সাধুরীতি ও চলিত রীতির কেউ কেউ পৃথক পৃথক, কেউ কেউ পাশাপাশি আলোচনা করেছেন।

১. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) সাধুভাষায় ক্রিয়া, সর্বনাম, বিশেষ্য ও অনুসর্গের পূর্ণ রূপ পাওয়া যায়। কিন্তু চলিত (কথ্য) ভাষায় সেগুলির সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা যায়।

যেমন - সাধু > চলিত

ক্রিয়া : করিতেছি > করছি, করিয়াছিলাম > করছিলাম, করিব > করব।

বিশেষ্য : বানিয়া > বেনে, জালিয়া > জেলে, পটুয়া > পেটো।

সর্বনাম : তাহা > তা, তাহার > তাঁর, উহা > ও, উহার > ওর।

অনুসর্গ : সহিত, সমভিব্যাহারে > সঙ্গে, হইতে > হতে, অপেক্ষা > চেয়ে।

২) সাধুভাষায় সংস্কৃত, তফসম, সন্ধি ও সমাসবদ্ধ এবং আভিধানিক শব্দের প্রাচুর্য; কিন্তু চলিত ভাষায় সহজ সরল ও বহু প্রচলিত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। সাধুভাষায় বাক্যের জটিলতা, শব্দের দুর্য্যোধ্যতা, প্রকাশের গুরু গম্ভীরতা লক্ষ্যনীয়। কিন্তু চলিত ভাষা এই সব গুলিকে পরিহার করে চলতে চায়। চলিত ভাষায় সংস্কৃতের পরিবর্তে তদ্ভব ও দেশী শব্দের প্রাধান্য। তার চাল লঘু ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাতে আছে কৃত্রিমতায়ুক্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য।

৩) অভিশ্রুতির প্রাচুর্য। মধ্যযুগের বাংলায় ছিল অপনিহিত ও বিপর্যাস। আধুনিক বাংলার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপনিহিতের পরের স্তর অভিশ্রুতি। যেমন-করে (করিয়া > কইর্যা > করে)। নেটো (নাটুয়া > নাউটুয়া > নেটো)। পাইয়া > পেয়ে। বইস > বস।

- ৪) আধুনিক বাংলা ভাষার রীতিতে স্বরসঙ্গতি প্রক্রিয়ায় দুটি বিষয় স্বরধ্বনি অভিন্ন বা প্রায় অভিন্ন স্বরধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।
যেমন- বিলাতি > বিলিতি। দেশি > দিশি। ভিখারি > ভিখিরা। কুড়াল > কুড়ুল।
- ৫) এ জুগের ভাষায় ব্যঞ্জন-সঙ্গতি বা সমীভবন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন-
পদ্ম > পদ। গল্প > গল্প। কপূর > কপ্পুর।
- ৬) ধ্বনি বিপর্যয় এ যুগের ভাষায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ। যেমন -
আলনা > আন্লা ; বারানসী > বেনারসী ;
- ৭) ধ্বন্যাগম ও ধ্বনিলোপ এই যুগের ভাষায় দুটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যেমন -
স্কুল > ইস্কুল ; স্পর্ধা > আস্পর্ধা ; সত্য > সতি ; ভগিনী > ভগ্নী ; নাতিনী > নাত্তী ; উদ্ধার > ধার।
- ৮) শব্দার্থ পরিবর্তন (শব্দের অর্থবিস্তার, অর্থসংকোচ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ) আধুনিক বাংলাভাষার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন-
'কালি' = আদি অর্থ-তরল কালো রং ; প্রাসরিত অর্থ- যে কোনো রং এর তরল রূপ।
'ভূত' = আদি অর্থ- ভরণের যোগ্য ; সংকুচিত অর্থ- চাকর।

২. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

- ১) আধুনিক বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার প্রচুর। যেমন -
গান করা, বাজনা বাজানো, বসে পড়া, শুয়ে থাকা, প্রশ্ন করা, উত্তর দেওয়া, নৌকা বাওয়া, বিবাদ করা।
- ২) ড. সুকুমার সেন বলেছেন, - আ-কারান্ত কোনো কোনো নিজন্ত ধাতুর রূপ অনিজন্য হয়ে দাঁড়ালো। যেমন-
পেলা, ফেলা (পেলায়, ফেলায়) > ফেল (ফেলে), খলা (খেলায়) > খেল (খেলে), পৌছা > পৌছ।
- ৩) আধুনিক বাংলায় সংযোজক অব্যয়রূপে 'ও', 'এবং' শব্দের প্রচুর ব্যবহার আছে। তবে সাধারণত মনে করা হয় 'ও' দুটি পদকে যোগ করে। 'এবং' দুটি বাক্যকে যোগ করে। ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও এদের ব্যবহার পর্যাপ্ত। যেমন-
রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে গিয়েছিল এবং গোদাবরী তীরে তারা কুঁড়ে বেঁধেছিল।
- ৪) আধুনিক বাংলায় নঞর্থক অব্যয় 'না', 'নি', 'নাই' প্রভৃতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সাধারণত এগুলি সমাপিকা ক্রিয়ার পরে বসে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। এই রীতিটি আধুনিক-পূর্ব যুগে ছিল না। এর উদাহরণ - সে খেল না (সমাপিকা ক্রিয়া) সে না খেয়ে চলে গেল (অসমাপিকা ক্রিয়া)
- ৫) আধুনিক বাংলায় অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটি মাত্র সরল বাক্যে প্রকাশ করার রীতি দেখা যায়। যেমন - একাধিক বাক্য = সে গান গাইল। সে পুরস্কার পেল। সে বাড়ি ফিরল। সে মাকে দেখাল। একটি সরল বাক্য = সে গান গেয়ে পুরস্কার পেয়ে বাড়ি ফিরে মাকে দেখাল।
- ৬) আধুনিক বাংলায় পদ গঠনের বিচিত্র বিধি। পন্ডিতেরা বলেছেন কর্তৃপদ তিন রকমের
ক) বিভক্তিহীন খ) 'এ' বিভক্তি যুক্ত গ) নির্দেশক প্রত্যয় যুক্ত। যেমন-
রাস্তায় লোক চলেছে। পাগলে কিনা বলে। লোকটা গেল কোথায়?

৩. বিদেশী শব্দের অনুপ্রবেশ:

বিদেশী শব্দ গ্রহণ- আধুনিক ভাষায় প্রচুর বিদেশী শব্দ ঢুকেছে-সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য গত কারণে। যেমন-
ইংরেজী শব্দ- গ্লাস, চেয়ার, টেবিল, রেডিও, ইউনিভার্সিটি, রিস্টোঁয়াচ।
পর্্তুগীজ শব্দ- আলপিন, আলমারি, কেরানী, চাবি।
এছাড়া বহু বিদেশী উপসর্গ বাংলা শব্দের যুক্ত হয়েছে। যেমন:
ফি (ফি বছর), বে (বেয়াদবি), হাফ (হাফটিকিট), ফুল (ফুলহাতা)।

৪. ছন্দ বৈশিষ্ট্য:

আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ছন্দের দ্যোতনা আমাদের মুগ্ধ করে। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত - এই তিন প্রধান ছন্দ এবং অমিত্রাক্ষর, গদ্য কবিতার ছন্দ প্রভৃতি ছন্দ-বন্ধ বাংলার ছন্দের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ ও সুসমৃদ্ধ করেছে।

Sub Unit - 4

বাংলা ভাষার আঞ্চলিক উপভাষা

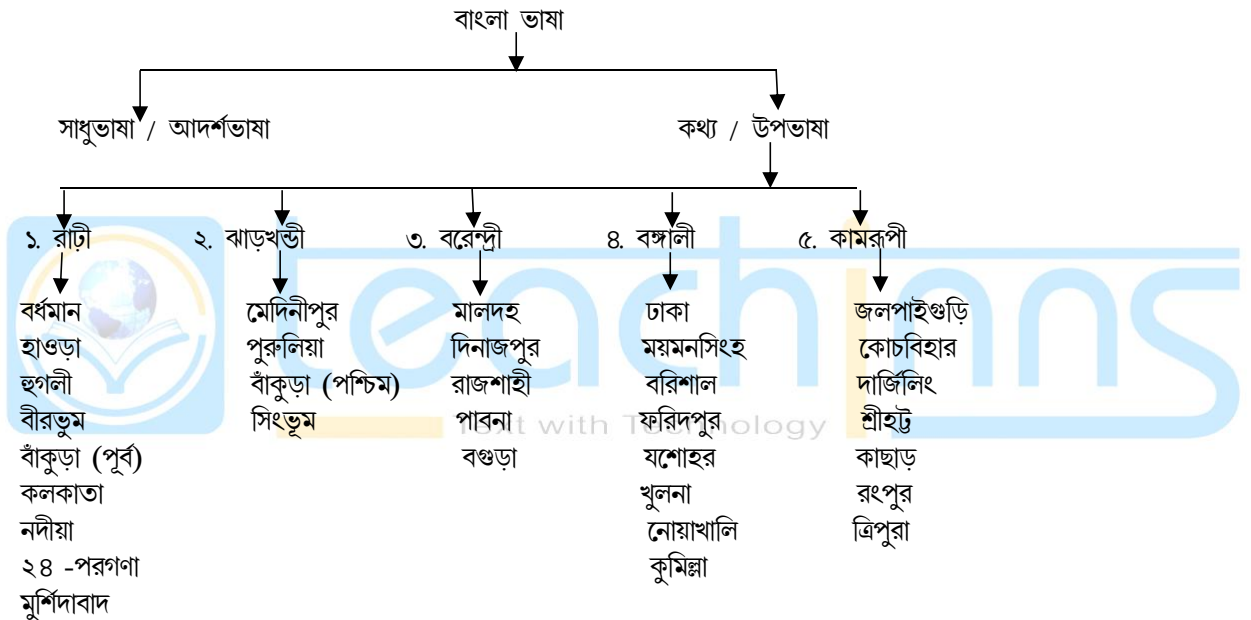
১.৪.১ উপভাষা

উপভাষার সংজ্ঞা:- উপভাষা সম্পর্কে আলোচনার আগে আমাদের জানা দরকার ভাষা কাকে বলে ?

এর উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায় ভাষা হচ্ছে কতকগুলি অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় করে। যে জন সমষ্টি একই ধরনের ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের দ্বারা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে ভাষা বিজ্ঞানীরা তাকে একটি ভাষা সম্প্রদায় বলেন।

তবে এক একটি ভাষা সম্প্রদায় যে ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময় করে, সেই ভাষারও রূপ সর্বত্র সম্পূর্ণ একরকম নয়। যেমন , বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে একই বাংলা ভাষা প্রচলিত ঠিকই কিন্তু ঐ দু-জায়গায় বাংলা উচ্চারণ ও ভাষারীতি পুরোপুরি একজরকম নয়। একই ভাষার মধ্যে এই যে আঞ্চলিক পার্থক্য একে বলে আঞ্চলিক উপভাষা।

১.৪.২ বাংলা ভাষার উপভাষা বিভাগ



১.৪.৩ ১। ‘রাঢ়ী উপভাষা’

(ক) Area বা এলাকা :

‘রাঢ়ী উপভাষা’ প্রধানত পশ্চিম বাংলার বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, হাওড়া, কলকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত।

(খ) বিস্তারিত সূক্ষ্মবিভাগ :

বাংলা ভাষার উপভাষা গুলির মধ্যে রাঢ়ীর বিস্তার সর্বাধিক। সেজন্যে রাঢ়ী উপভাষার মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায়। যেমন - ‘পূর্ব বাঁকুড়া’র লোকেরা যেভাবে কথা বলে, ‘হাওড়া’র লোকেরা সেভাবে বলে না। আবার ‘হুগলী’র লোকেরা যেভাবে কথা বলে, ‘দক্ষিণ ২৪-পরগণা’র লোকেরা সেভাবে কথা বলে না। তাই রাঢ়ী উপভাষাকেও কেউ কেউ চারভাগে ভাগ করতে চান :

অ। পূর্ব রাঢ়ী - কলকাতা, ২৪ পরগণা, বর্ধমান (পূর্ব), হাওড়ায় প্রচলিত কথ্য ভাষা।

আ। পশ্চিম রাঢ়ী - বাঁকুড়া (পূর্ব), হুগলী, বীরভূম, বর্ধমানে (পশ্চিম) প্রচলিত কথ্য।

ই। উত্তর রাঢ়ী - নদীয়া, মুর্শিদাবাদে প্রচলিত কথ্য।

ঈ। দক্ষিণ রাঢ়ী - দক্ষিণ পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রচলিত কথ্য।

আবার কেউ কেউ অন্যভাবেও বিভাগ নির্দেশ করেছেন।

কেউ কেউ ‘পূর্ব রাঢ়ী’ ও ‘পশ্চিম-রাঢ়ী’ নামেও দুটিবিভাগ করেছেন।

(গ) রাঢ়ী উপভাষার উদাহরণঃ

আদর্শ রাঢ়ী : হতভাগা ছেলে ! তোকে কখন বলেছি - গাইটো দুইয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছেলের কথা শোনো, বলে কি না, শীত করছে ! ঘাড়টা ধরে নিয়ে আসবো। মারবো গালে চড়।

পশ্চিম রাঢ়ী : হতভাগা ছেল্যা ! তুখে কখন বলেছি, গাইটাকে দুয়ে দিয়ে বাজারে যা। তা ছেল্যা কুনঅ কথা শুনবেক নাই। বলছে, জাড়াছে বটে। ঘাড় ধরো লিয়গে আইসবা। গালে চড়াই দিব।

রাঢ়ী উপভাষাই আদর্শ বাংলাভাষার উৎস স্থল। আজকে সারা বাংলায় যে-ভাষা ‘আদর্শ’ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা এই রাঢ়ী উপভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

(ঘ) রাঢ়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য :

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. রাঢ়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য - ‘অ’ স্থলে ‘ও’ উচ্চারণ। যেমন :

হল > হলো। মত > মতো। বড় > বড়ো। অতুল > ওতুল। অজিত > ওজিত।

মধু > মোধু। তথ্য > তথ্যো। পাগল > পাগোল। মন > মোন। পরমান > প্রোমান।

বন > বোন (জঙ্গল)।

২. রাঢ়ী উপভাষার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য - ‘অভিশ্রুতি’। অর্থাৎ শব্দ মধ্যে অপিনিহিতির ‘ই’ বা ‘উ’ ধ্বনি লোপ পাবে ; অথবা ই/উ অন্য স্বরের প্রভাবে লোপ পাবে, অথবা অন্য স্বরের সঙ্গে মিশে নতুন রপ পাবে - সেই হল অভিশ্রুতি।

যেমন : করিয়া > কইর্যা > করে ; চারি > চাইর > চার ; বহিন > বইন > বোন ;

৩. রাঢ়ী উপভাষায় পদের আদিত শ্বাসাঘাত প্রবণতা আছে এবং তারই ফলে পদের মধ্যবর্তী ও অনন্তগত মহাপ্রাণবর্ণ অল্পপ্রাণবর্ণে পরিণত হয়। যেমন :

দুধ > দুদ ; বাঘ > বাগ

৪. রাঢ়ী উপভাষায় শব্দান্তস্থিত অযোষধ্বনি যোষধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন :

কাক > কাগ, ছাত > ছাদ, উপকার > উবগার।

৫. রাঢ়ী উপভাষায় নাসিকীভবন ও স্বতোনাসিকীভবনের প্রাধান্য দেখা যায়। যেমন :

পুস্তিকা > পুখিআ > পুখি - পুখি। সূচ > ছুঁচ, পেচক > পেঁচা।

ইষ্টক > ইট - ইটা। তেমনি - চাঁদ (< চন্দ্র), বাঁশ, আঁটা, চাঁক।

বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার প্রচুর আনুসঙ্গিকের আগম - চাঁ হইয়েছে না কি বাঁ (= চা হয়েছে কি, ও হে) ! ফুঁটাই মরে যাঁবি (= দেহ ছিন্নভিন্ন বা বিদীর্ণ হয়ে মারা যাঁবি)।

৬. রাঢ়ী উপভাষায় অনেকসময়ই ন > ল, ল > ন হয়। যেমন :

ন > ল - নৌকা > লৌকা, নয় > লয়, নড়া > লড়া।

ল > ন - লংকা > নংকা, লুচি > নুচি, লোহা > নুয়া (নোয়া), লেবু > নেবু ,

লাউ > নাউ, লবন > নুন, গুলো > গুনো।

৭. রাঢ়ী উপভাষায় অনেক সময় শব্দ মধ্যস্থ পাশাপাশি অবস্থিত বিষমধ্বনির সমধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে। যেমন :

বিলাতি > বিলিতি। দেশি > দিশি।

৮. রাঢ়ী উপভাষায় অনেক সময় ‘হ’ কার লোপ পায়। যেমন :

তাহার > তার, কহি > কই, দহ > দ।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

রাঢ়ী উপভাষার রূপতত্ত্বগত নানা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান :

১. রাঢ়ী উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘গুলি’, ‘গুলা’, ‘গুলো’ এবং অন্যান্য কারকের বহুবচনে ‘দের’ বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন :

গুলি, গুলো, গুলো - ছেলেগুলি, মেয়েগুলো, পাখিগুলো। ছেলেগুলি ভাত খায়।

দের - আমাদের, তাদের, রামেদের, পাখিদের, তোদের।

তোদের দিয়ে কাজটা হবে (করন কারকে)।

আমাদের খেতে দাও (কর্মকারকে)।

২. রাঢ়ী উপভাষায় অধিকরণ কারকে ‘এ’ বা ‘তে’ বা ‘এতে’ বিভক্তির যোগ হয়।
 যেমন : এ - ঘরে এসো। বনে গাছ নেই। জলে মাছ আছে। দেশে দেশে মোর ঘর আছে।
 তে - বাড়িতে এসো। ঝাঁকুড়াতে দেখে এলাম।
 এতে - ঘরেতে ভাত নেই। জলেতে মাছ আছে।
৩. রাঢ়ী উপভাষায় মুখ্য-কর্মে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। কিন্তু গৌণকর্মে ‘কে’ বিভক্তি যোগ হয়। যেমন -
 শিক্ষকমশায় ছাত্রদেরকে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।
 - এখানে মুখ্য কর্ম - ‘ব্যাকরণ’ : ‘ব্যাকরণে’ কোনো বিভক্তি নেই।
 - এখানে গৌণকর্ম - ‘ছাত্রদেরকে’ : ছাত্রদেরকে শব্দে ‘কে’ বিভক্তি যোগ হয়েছে। অন্য উদাহরণ :
 (ক) ছেলটাকে (গৌণকর্ম) একটা বল (মুখ্য কর্ম) দাও।
 (খ) তোমাকে (গৌণকর্ম) গান (মুখ্যকর্ম) শোনাবো।
 (গ) বাবা, আমাকে (গৌণকর্ম) একবার বাড়ি (মুখ্যকর্ম) লইয়া যাও।
৪. রাঢ়ী উপভাষায় কাল ও পুরুষবাচক বিভক্তি নিম্নরূপ :
 (ক) বর্তমান কালে
 উত্তম পুরুষ - ‘ই’ বিভক্তি : আমি গান করি। আমরা আসি।
 মধ্যম পুরুষে - ‘অ’, ‘ও’, ‘ইস’ : তুমি গান কর। তোমরা এসো। তুই আসিস।
 প্রথম পুরুষে - ‘এ’, ‘এন’ : সে গান করে। তিনি আসেন।
 (খ) অতীত কালে :
 উত্তম পুরুষে - উম, আম বিভক্তি : আমি গান করলুম। গান গেয়েছিলুম। গেয়েছিলাম।
 মধ্যম পুরুষে - এ, এন, ই বিভক্তি : তুমি গান করেছিলে। আপনি গেয়েছিলেন। তুই গেয়েছিলি।
 প্রথম পুরুষে - অ, এন বিভক্তি : সে গান করেছিল। তিনি গেয়েছিলেন।
 (গ) ভবিষ্যৎ কালে
 উত্তম পুরুষে - ব, বো, ও : আমি গান করবো। আমরা গাবো।
 মধ্যম পুরুষে - বে, বেন, বি : তুমি গান করবে। আপনি গান করবেন। তুই গান করবি।
 প্রথম পুরুষে - বে, বেন : সে গান করবে। তিনি গান করবেন।
৫. যৌগিক ক্রিয়া গঠনের পদ্ধতি :
 আচার্য সুকুমার সেন বলেন, রাঢ়ীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে (ই)-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া অসম্পন্ন কালের এবং (ইয়া) অন্ত অসমাপিকা দিয়া সম্পন্ন কালের পদ গঠিত হয়।
 যেমন : করিয়াছে > করেছে, করিতেছিল > করছিল, করিয়াছে > করেছে, করিয়াছিল > করেছিল।

২। ‘ঝাড়খড়ী উপভাষা’

(ক) Area বা এলাকা :

‘ঝাড়খড়ী উপভাষা’ প্রধানত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, দক্ষিণ পশ্চিম ঝাঁকুড়া ও সিংভূম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ‘ঝাড়খড়ী’ নামটি দিয়েছেন সুকুমার সেন। উল্লিখিত অঞ্চলটি একদা ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল বলে ‘জঙ্গল মহল’ নামেও পরিচিত ছিল। ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ এই অঞ্চলকেই বলা হয়েছে ‘ঝাড়খড়’। ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে প্রায় আড়াই হাজার বর্গমাইল স্থানে ‘ঝাড়খড়ী উপভাষা’ বিস্তৃত বলে জানিয়েছেন।

(খ) ঝাড়খড়ী উপভাষার উদাহরণ :

অ দিদি, চিনাই দে ন কে বটে লকটি।
 অ বিষ্টুপুরের হলদ মাখে গা করেছে আল।
 অ বহিন, নামহ কুলহিতে মাদল বাজে
 পান চিবাঁই উটা : ঘুরে মরছে ভাল ।। অ দিদি গ.....

আদর্শ বাংলার রূপান্তর :

ওগো দিদি, লোকটি কে বটে, আমাকে চিনিয়ে দাও। লোকটি বিষ্টুপুরের হলুদ মেখে গা টি
 আলোর মতো উজ্জ্বল করছে। ওগো বোন, নামোকুলিতে মাদল বাজছে। লোকটি পান
 চিবিয়ে চিবিয়ে সানন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(গ) ঝাড়খড়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :**

- ঝাড়খড়ী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য আনুসঙ্গিক ধ্বনির প্রচুর প্রয়োগ।
যেমন : আটা > আঁটা, বাসা > বাঁসা।। চা > চাঁ। গরুড় > গুঁড়ুর। ঘড়া > ঘাঁড়া। কুয়ো > কুঁই। জটা > জঁটা।
দেশজ / আঞ্চলিক শব্দে আনুসঙ্গিকতা : কঁকা (বোবা)। কঁচড় (কোমর)। আঁক (কাঠের দরজা)। চঁদড় (বদরাগী)।
- ঝাড়খড়ী উপভাষাতে প্রায় সবত্রই ‘ও’-কার লোপ পেয়ে ‘অ’ কারে পরিনত হয়েছে।
যেমন : লোক > লক ; গোয়ালা > গয়াল ; মোটা > মটা ; রোগা > রগা ; ঘোড়া > ঘড়া। অশোক > অশক।
আলো > আল।
- ঝাড়খড়ী উপভাষায় অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন : দূর > ধূর। কঁকড়া > খাঁকড়া। তোকে > তখে। পতাকা > ফতকা। কাঠি > খাড়ি। নিতাম > লিখম।
- ঝাড়খড়ী উপভাষাতে ‘ল’ ও ‘ন’ এবং ‘ব’ ও ‘ম’ বিপর্যস্ত হয়েছে।
যেমন : নাতি > লাতি। লাল > নাল। নাচনী > লাচনী। যমুনা > যবুনা। রামায়ণ > রাবায়ণ।
- ঝাড়খড়ী উপভাষায় মহাপ্রাণতার নবতর বৈশিষ্ট্য হলো : - ‘হ’, ‘মহ’, ‘লহ’, ‘রহ’ কিংবা ‘ঢ’ প্রভৃতির বিশিষ্ট ব্যবহার।
যেমন : কুমার > কুমহার। কুমীর > কুমহীর। কুলি > কুলহি। পালা > পালহা। জোড়া > জোড়হা। গেড়ি > গেঢ়হি।
কালহা (ঠান্ডাঅর্থে)। চুলহা (উনুন অর্থে)।
- ঝাড়খড়ী উপভাষায় স্বরসঙ্গতির তেমন প্রভাব নেই।
যেমন : ধূলা > ধূলা। শিয়াল > শিয়াল।
- বহুবচনে ‘গা’, ‘গিলা’র প্রয়োগ। যেমন : গরুগিলা ডহরাঁই দে। কামিনগাকে যাতে বল। ছঁড়াগা মরে নাইখ।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

- ঝাড়খড়ী উপভাষার ক্রিয়াপদে সার্থিক ‘ক’ প্রত্যয়ের প্রচুর ব্যবহার :
যেমন - যাবেক নাই। মরবেক করবেক।
- ঝাড়খড়ী উপভাষায় নাম-ধাতুর প্রচুর ব্যবহার :
যেমন - জাড়াচ্ছে। সিঁদাঁইছিল। মেঘ বিজলাচ্ছে। ভোকে খাবলাঁই মরছে। হড়বড়াঁই যাচ্ছে। চটাই দিব। পখরের জলটা গঁধাচ্ছে।
- ঝাড়খড়ী উপভাষায় ‘আছ’ ধাতুর বদলে ‘বট’ ধাতুর প্রয়োগ :
যেমন - উ টা হঁউড়ার বটো। কে বটো লক টি। বিটি বটো না।
- ঝাড়খড়ী উপভাষায় বিভক্তির প্রয়োগ নিম্নরূপ :
(ক) কর্মে ও সম্প্রদান কারকে ‘কে’ বিভক্তি - জলকে গেছে , ঘরকে চল।
(খ) অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হল - ‘লে’, ‘নু’। যেমন : মায়ের লে মাসীর দরদ। বাঁশের নু কঁইচি বড়।
বেকারের নু বেগার ভাল।
(গ) অধিকরণে ‘কে’, ‘এ’ বিভক্তি। যেমন : কে = রাইতকে বড় জাড়াবেক। কবকে যাবি গা। গাঁকে আল সুরু শাঁকা।
এ = সিতাএ সিঁদুর দে। কুলহিএ কেউ নাইখ। গাড়াএ জল বঠে ন ।।

৩। ‘বরেন্দ্রী উপভাষা’**(ক) Area বা এলাকা :**

‘বরেন্দ্রী উপভাষা’ উত্তর বঙ্গে প্রচলিত। প্রধানত মালদহ, দিনাজপুর এবং বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা,, বগুড়া জেলার লোখমুখের ভাষাকেই ‘বরেন্দ্রী উপভাষা’ বলে।

ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন - একদা রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী একই উপভাষা ছিল। পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ‘বঙ্গালী’ ও বিহার থেকে আগত ‘বিহারী’ উপভাষার নানা প্রভাব পড়ে মালদহ প্রভৃতি স্থানের মৌখিকভাষা একটি স্বতন্ত্র উপভাষা রূপে পরিগণিত হয়। তারই নাম ‘বরেন্দ্রী’।

(খ) বরেন্দ্রী উপভাষার উদাহরণ :

মালদহ জেলার পশ্চিমাংশে ব্যবহৃত -

হতভাগা ছুয়া ! হামি কহনু এ্যাকনা গড়ুডা দুহায় লিয়ে হাটত যা। উকি শুনহে ? উ কহছে, বড়া জার লাগছে।
গর্দানটা ধর্যা ওয়াক্ লিয়ে আয়। গালত চর ঠাটামু।

(গ) বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :**

১. বরেন্দ্রী উপভাষায় ঠিক রাঢ়ী মতোই আনুসঙ্গিক স্বরধ্বনি আছে।
যেমন - কাঁটা, চাঁদ, ইঁট, পুঁথি, ছুঁচ, পেঁচা।
২. বরেন্দ্রী উপভাষায় স্বরধ্বনি প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। তবে এ > এ্যা হয়।
যেমন - দ্যান, দিল্যান, এ্যাক, দ্যাক, দ্যাও।
৩. বরেন্দ্রী উপভাষায় কেবলমাত্র শব্দের আদিতে সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকে। শব্দের মধ্যে ও শেষে থাকলে সেগুলি অল্পপ্রাণ হয়ে যায়। যেমন - বাঘ > বাগ।
৪. বরেন্দ্রী উপভাষায় বঙ্গালীর মতো জ > জ (Z) রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন - জন > ঞন (Zan), কালী পূজা > খালিফুজা। কাগজ > খাগজ।
৫. বরেন্দ্রী উপভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অপ্রত্যাশিত স্থানে ‘র’ এর আগম বা লোপ।
যেমন : (ক) শব্দের আদিতে যেখানে ‘র’ নেই, সেখানে ‘র’ এসে যায় - আম > রাম।
(খ) শব্দের আদিতে যেখানে ‘র’ আছে, তা আকস্মিক উচ্চারণে লোপ পায় ও ‘অ’ উচ্চারিত হয় - রস > অস।
উদাহরন - রামবাবুর আমবাগান > আমবাবুর রামবাগান।
আমের রস > রামের অস।
৬. বরেন্দ্রী উপভাষায় শ্বাসাঘাতের কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. বরেন্দ্রী উপভাষায় কর্তৃকারকের বহুবচনে ‘গুলি’, ‘গিলা’, এবং অন্য কারকের বহুবচনে ‘দের’ বিভক্তি দেখা যায়।
যেমন : বান্দরগিলা। মাইয়াদের।
২. বরেন্দ্রী উপভাষায় অধিকরণ কারকে ‘ত’ বিভক্তি প্রয়োগ দেখা যায়।
যেমন : মনে > মনত ; বুক > বুকত ; বাড়িতে > বাড়িত (বাইগন বাড়িত উভাও সার)
৩. বরেন্দ্রী উপভাষায় অতীত কালের উত্তম পুরুষে ‘লাম’; ভবিষ্যত কালের উত্তম পুরুষে ‘মু’, ‘ম’ বিভক্তি দেখা যায়।
যেমন : ‘কলা গাড়লাম সারি সারিরে’; ‘আর কতয়কাল রাখিম ডালিম চোরক দিয়া ফাঁকি।’; ‘মুই নারী ক্যামনে দিম্ পারি রে।’
৪. বরেন্দ্রী উপভাষাতে গৌণ কর্মে ‘কে’, ‘ক’ বিভক্তি দেখা যায়।
যেমন : ‘হামাক দাও’; ‘অবোদ একটা পাগোলক্ ধরিয়া’।

৪. ‘বঙ্গালী উপভাষা’**(ক) Area বা এলাকা :**

‘বঙ্গালী উপভাষা’ রাঢ়ী উপভাষার মতোই বিস্তার লাভ করেছে। পূর্ববাংলার এটি প্রধান উপভাষা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি বিশাল এলাকা জুড়ে ‘বঙ্গালী উপভাষা’ প্রচলিত। তবুও মনে রাখতে হবে, এই সব জেলাগুলির মধ্যে লোকমুখের উচ্চারণে আরও অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

(খ) বঙ্গালী উপভাষার উদাহরণ (ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত) :

ছাইকপাইলা পোলারে ! কি আর কমু? কোন্ হাত হাকালে কইচি - গরুডারে পানাইয়া বাজারে যা। এমনু পোলা ! তা নিকথা হোনে ? কয়, হীতে ধরচে। দ্যাক্ , ঘাড়ু ধইরা লৈয়া আমু , মারুম গালে থাপর।

(গ) বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :**ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :**

১. বঙ্গালী উপভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য অপিনিহিতির সার্বিক প্রয়োগ। সাধারণ শব্দে তো বটেই, ‘ক্ষ’, ‘ক্ষ্ম’, ‘জ্ঞ’, বা ‘য’-ফলা যুক্ত শব্দেও অপিনিহিতি বর্তমান।
যেমন : করিয়া > কইর্যা ; ধরিয়া > ধইর্যা ; আজি > আইজ ; লক্ষ > লইকখ ; ব্রাহ্ম > ব্রাইন্ম ; যজ্ঞ > যইগ্ন।
২. বঙ্গালী উপভাষায় সংবৃত ‘এ’ > বিবৃত ‘এ্যা’।
যেমন : কেশ > ক্যাশ ; তেল > ত্যাল ; দেশ > দ্যাশ্ ; কেন > ক্যান।

৩. বঙ্গালী উপভাষার ‘র’ ও ‘ড়’ এর প্রচলিত বিপর্যয়। অর্থাৎ এই উপভাষীরা ‘ড়’ কে ‘র’ এবং ‘র’ কে ‘ড়’ উচ্চারণ করে।
যেমন : তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো > তারাতারি বারি আইসো। চার > চাড়, করি > কড়ি। ঘোড়ার গাড়ি > ঘোরার গারি।
ঘরভাড়া > ঘড় ভারা।
৪. বঙ্গালী উপভাষাতে অনেক সময় ‘ও’ > ‘উ’ উচ্চারিত হয়।
যেমন : কোদাল > কুদ্যাল ; কোপ > কুপ ; দোষ > দুষ। কোট > কুট।
৫. বঙ্গালী উপভাষাতে ‘শ’ এবং ‘স’ স্থানে ‘হ’ উচ্চারিত হয়।
যেমন : শালা > হালা ; শাক > হাগ ; সকল > হগল ; বসো > বহো।
৬. বঙ্গালী উপভাষায় ‘চ’ > ‘ৎস’, ‘ছ’ > ‘স’ এবং ‘জ’ > ‘জ’ (z) উচ্চারিত হয়।
যেমন : চাঁদু > চা (ৎসা) দু ; খেয়েছে > খাইসে ; জান দিলাম > জান (zan) দিমু।
৭. বঙ্গালী উপভাষাতে শব্দের আদিতে ও মধ্যে অবস্থিত ‘হ’, - ‘অ’ রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন : হতভাগা > অতোভাগা ; হয় > অয়।
৮. বঙ্গালী উপভাষায় অনেক সময় শব্দের মধ্যস্থিত ট, ঠ - ‘ড’ তে রূপান্তরিত হয়।
যেমন : দুইটি মিঠা পান নিলাম > দুইডি মিডা পান লিমু ; এটা সেটা > ইডা-সিডা।
৯. বঙ্গালীতে অনেক সময় ‘ল’ > ‘ন’ লক্ষ্য করা যায়।
যেমন : ‘লক্ষ্মীপূজার নাড়ু’ > ‘নক্সী ফুজার নারু’। লাউ > নাউ ; লোভ > নোভ।
১০. বঙ্গালীতে অস্থানে আনুনাসিক আসে না - স্বস্থানেও আনুনাসিক লোপ পায়।
যেমন : চাঁদ > চাদ। কাঁদা > কাদা। বাঁধন > বাধন।

রূপতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য :

১. বঙ্গালী উপভাষায় কর্তৃকারকে ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ যথেষ্ট।
যেমন : নবীন আসে > নবীন আইসে। আপনি ঠিকই বলছেন > আপনে ঠিকই কইছেন। না হলে মানুষ বিশ্বাস করে না > না হইলে মাইনষে বিশ্বাস করে না।
২. বঙ্গালী উপভাষায় গৌণকর্মে ‘রে’ বিভক্তি হয়।
যেমন : আমরা মারে ক্যান, ‘তারে খাইসে দ্যাও’।
৩. কর্তৃকারক ভিন্ন অন্য সব কারকে বহু বচনে ‘রা’, (রার) গো (গোর) বিভক্তি যুক্ত হয়।
যেমন : ‘আমরার’, ‘আমগোর’, আমাগো, তোমাগো।
৪. অধিকরণকারকে ‘এ’, ‘তে’, ‘ত’ বিভক্তি যোগ হয়।
যেমন : পাগিতে ভিজাও, ‘জলে ডুইব্যা মর’, ‘ঘরিৎ কয়ডা বাজে’।
৫. বঙ্গালীতে করণকারকে ‘এ’ বিভক্তি তো আছেই। এছাড়া ‘দিয়া’, ‘লগে’, ‘সাথে’ প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার।
যেমন : তোরে দিয়া কাজ হবা না।
৬. বঙ্গালী উপভাষাতে অপাদান কারকে ‘ত’, ‘তনে’, ‘তোন’ এবং ‘থন’, ‘থনে’, ‘থুন’ ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার আছে।
৭. অতীত কালে (ক) উত্তম পুরুষের বিভক্তি ‘আম’ - তার কথা হামি হনতাম (শুনতাম)।
(খ) মধ্যম পুরুষের বিভক্তি ‘লা’। যেমন : আমগোর কি করলা।
৮. বঙ্গালী উপভাষাতে ভবিষ্যৎকালের উত্তমপুরুষের বিভক্তি ‘ম’, মধ্যম পুরুষের বিভক্তি ‘বা’ এবং প্রথম পুরুষের বিভক্তি ‘ব’। যেমন : ‘কোথায় পাইবাম কলসি কইনা।’
‘তুমি তার কুনু কতা বুঝবা না।’
‘তাহারে দিয়া এ কাম চলবা না।’
৯. বঙ্গালী উপভাষায় যৌগিকক্রিয়াপদে ‘ই’ অন্ত অসমাপিকাক্রিয়া দিয়ে সম্পন্নকাল গঠন।
যেমন : করিয়াছি > করসি, করতে আছি।
১০. বঙ্গালী উপভাষায় ‘ইতে’ অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে অসম্পন্ন কাল গঠন।
যেমন : করিতেছি > কইরত্যাছি।
১১. বঙ্গালী উপভাষায় সামান্য বর্তমান দিয়ে ঘটমান বর্তমান প্রকাশ।
যেমন : দুই ছালা কোবাকুবি কইর্যা মরে। মায়ে ডাকে।

৫. ‘কামরূপী (বা রাজবংশী) উপভাষা’

(ক) Area বা এলাকা :

‘কামরূপী (বা রাজবংশী) উপভাষা’ প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট, কাছাড়, রংপুর ও ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রচলিত। এই উপভাষা অনেকটা বরেন্দ্রী ও অনেকটা বঙ্গালীর মিশ্রণে গড়ে ওঠেছে। কারো কারো ধারণা কামরূপী হলো কামরূপের নিকটবর্তী উপভাষা, তা ‘বঙ্গালী’র রূপভেদ মাত্র। আবার কেউ কেউ মনে করেন - কামরূপীর পূর্বদিকের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থেকেই অসমীয়া ভাষা গড়ে ওঠেছে।

(খ) কামরূপীর উপভাষার নিদর্শন :

তুই কোটে যাইস ?
মুই কইলকাতা যাবার ধরচিৎ।
কইলকাতা এক আজব শহর। পৃথিবীর সউগ দেশের মানসি সেটে দেখির পাবু।
আসবু কুন দিন ?
বছর ডেরেক পাতে।
চিনির পাবুতো ? দেখিস ফির গোটায় বদলি না যাইস। আমার গুলার কতাও মাঝে মাঝে মানত করবু।

(গ) কামরূপী উপভাষার বৈশিষ্ট্য :

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. উপভাষায় বরেন্দ্রীর মতো অপিনিহিতি আছে, তবে তুলনায় কম। যথা : আজি > আইজ।
২. কামরূপী উপভাষায় বঙ্গালীর মতই ‘র’ এবং ‘ড়’-এর বিপর্যয় ঘটে। যেমন : শাড়ী পরে বাড়ি যাব। > সারি পইর্যা বারি যামু।
৩. কামরূপী উপভাষাতে বঙ্গালীর মতোই চ > ৎস, ছ > স ; জ > দ, জ (Dz), ঝ > z হয়।
৪. কামরূপী উপভাষাতে অনেক সময় ‘ন’ ও ‘ল’-এর বিপর্যয় ঘটেছে। যেমন - লাজল > নাজল, লাল > নাল।
অপরপক্ষে - জননী > জলনী, সিনান > সিলান।
৫. কামরূপী উপভাষায় পদের আদিতে মহাপ্রানব্যঞ্জন বজায় থাকে। কিন্তু পদের মাঝে বা শেষে থাকলে, তা আল্পপ্রাণে পরিণত হয়।
৬. কামরূপী উপভাষায় ‘শ’, ‘ষ’, ‘স’ সবই ‘শ’ উচ্চারিত হয়।
৭. কামরূপীতে শব্দের ‘অ’ শ্বাসাঘাতের জন্য ‘আ’ উচ্চারিত হয়। যেমন - অতি > আতি ; অসুখ > আসুখ ; কথা > কাথা।
৮. কামরূপীতে কখনো কখনো ‘ও’ > ‘উ’ হয়। যেমন - কোন > কুন, বোন > বুন।
৯. কামরূপী উপভাষায় অনেক সময় স্বরধ্বনিতে অনুনাসিকতা দেখা যায়। যেমন - ইহা > ইয়া ; উহা > উয়া।
১০. কামরূপীতে কখনো কখনো শব্দের অদিস্থিত ‘র’ ধ্বনি বর্জিত হয় এবং ‘অ’ ধ্বনি রক্ষিত হয়। যেমন : রাতি > আতি; রাগ > আগ; রভস > অভশ

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :

১. কামরূপী উপভাষাতে মুখ্যকর্মে ও গৌণকর্মে ‘ক’ বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : আমাকে ভাত দাও > হামাক বাত দ্যাও।
২. কামরূপী উপভাষাতে অধিকরণে ‘ত’ এবং অপাদানে ‘থাকি’ অনুসর্গ যোগ হয়। যেমন : ‘ঘরত যামু’। ‘পাছত’। ‘ঘর থাকি’।
৩. কামরূপী উপভাষাতে পুরুষভেদে সর্বনামের নিম্নোক্ত রূপ লক্ষ্য করি :
(ক) উত্তম পুরুষে ‘মুই’ - আমরা।
(খ) মধ্যম পুরুষে ‘তুই’ - তোমরা।
৪. কামরূপী উপভাষাতে মধ্যম পুরুষের অতীতকাল ও ভবিষ্যৎকালে ‘উ’ বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : ‘তুই করলু’, ‘তুই করবু’।
৫. কামরূপী উপভাষাতে ‘ই’ প্রত্যয় দেখিয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন : দেখি, পাই।
৬. কামরূপীতে যৌগিক ক্রিয়াপদে খোয়া ধাতুর ব্যবহার আছে। যেমন - রাগ করা > ‘আগ খোয়া’; মনে লাগা > ‘মনত খোয়া’।

৭. কামরূপীতে ক্রিয়াপদের পূর্বে নঞর্থ উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। (এ বৈশিষ্ট্য রাঢ়ীতেও আছে।
যেমন : ‘না জাওঁ’; ‘না লেখিম্’।।



teachinns
Text with Technology

Sub unit - 5

১.৫.১ ধ্বনি (Sound)

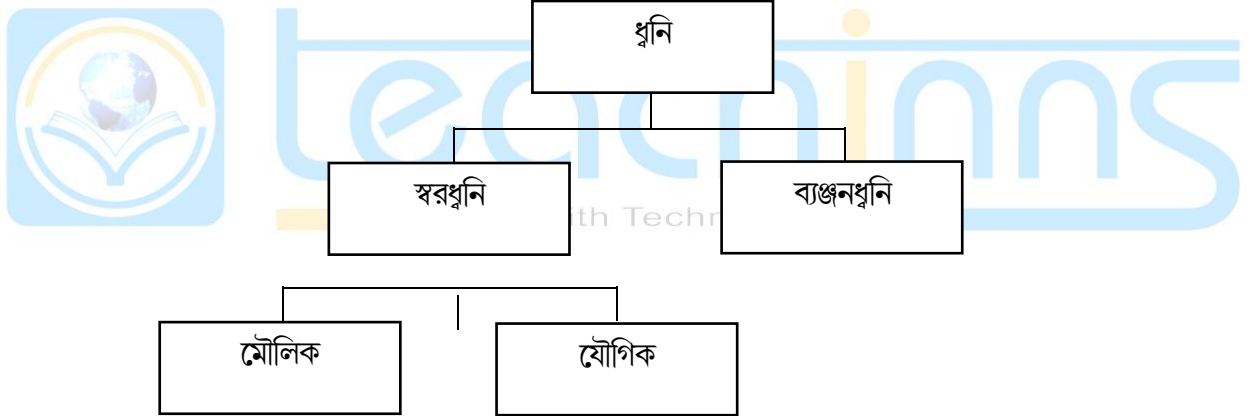
(ক) ধ্বনি : সংজ্ঞা ও উদাহরণ

ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান হল ‘ধ্বনি’। মানুষ স্বেচ্ছায় তার বাগযন্ত্র থেকে বায়ুস্তরে শোনার মতো যে-স্পন্দন তোলে, তাকে ‘ধ্বনি’ বলে। যেমন : অ আ ই ঈ ঙ্গ খ্গ শ্গ হ্ - এদের উচ্চারণটুকুই ধ্বনি।

(খ) ধ্বনির বৈশিষ্ট্য

- ১। ধ্বনি একমাত্র মানুষেরই কণ্ঠজাত।
- ২। পশুপাখির ডাক বা পদার্থের ওপর আঘাত সৃষ্ট কোনো আওয়াজ ধ্বনি নয়।
- ৩। ধ্বনি শ্রুতিগ্রাহ্য - তা কানে শোনা যায়।
- ৪। ধ্বনি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় - অর্থাৎ ধ্বনি দেখা যায় না। তাই ধ্বনি রূপহীন। তার কোনো চেহারা নেই - প্রতীক নেই।
- ৫। ধ্বনিকে রূপ দিলেই তার নাম হবে ‘বর্ণ’। সুতরাং যা শোনার বিষয় তার নাম ‘ধ্বনি’ - আর সেই ধ্বনি যদি চোখে দেখার বিষয় হয়, তবে তার নাম হবে ‘বর্ণ’। বর্ণ হল ধ্বনির প্রতীক। তাই ধ্বনি ও বর্ণ - একই জিনিস। যেমন - ‘অ’ বললে যা শুনি - তা-ই হলো ‘ধ্বনি’। আর ‘অ’ লিখলে যা-দেখি তা-ই হলো বর্ণ।
- ৬। ধ্বনি হলো ভাষার সবচেয়ে ছোট উপাদান। অনেক ধ্বনি মিলে শব্দ--অনেক শব্দ মিলে বাক্য। অনেক বাক্য মিলে ভাষা। ধ্বনি > শব্দ > বাক্য > ভাষা ।।

৩। ধ্বনির শ্রেণীবিভাগ



ধ্বনি দু প্রকার - স্বরধ্বনি (স্বরবর্ণ) ও ব্যঞ্জনধ্বনি (ব্যঞ্জনবর্ণ) ।।

৪। বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান ও উচ্চারণপ্রকৃতি নির্ণয়

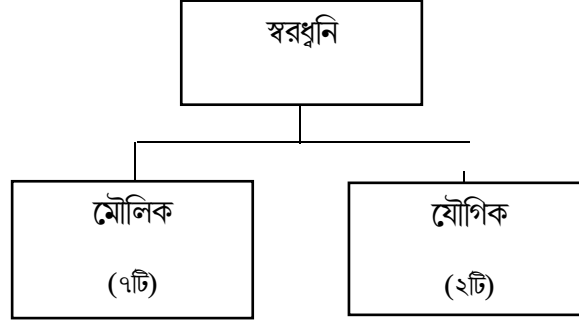
(ক) স্বরধ্বনি (Vowel)

যে ধ্বনি মানুষের বাগযন্ত্র থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিকভাবে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাকে ‘স্বরধ্বনি’ বলে।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই স্বরধ্বনি আছে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনি ছিল ১৩টি। আমাদের প্রচলিত জ্ঞানে বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনি আছে ১১টি। সেগুলি হলো : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ। সংস্কৃতের ঙ্গ, দীর্ঘ ঙ্গ, ঋ (দীর্ঘ ঋ) বাংলায় নেই। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে বাংলার ঐ ১১টি স্বরধ্বনিই পৃথক পৃথক মর্যাদায় স্বীকৃতি লাভ করেনি। ভাষাবিজ্ঞানে বাংলার স্বরধ্বনি হলো ৯টি : অ, আ, ই (ঈ), উ (ঊ), এ, ঐ, ও, ঔ, অ্যা।

তবে ঐই ‘অ্যা’কে অনেকে স্বীকার করেন না। আবার ঐ, ঔ-এর মতো যৌগিক স্বরধ্বনিও বাংলায় অন্ততঃ ২৫টি আছে।

(খ) স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ



ভাষাবিজ্ঞানে স্বরধ্বনি দু প্রকার : (১) মৌলিক (২) যৌগিক।

(১) মৌলিক স্বরধ্বনি (Cardinal Vowel)

সংজ্ঞা : যে স্বরধ্বনি গুলি একক ও অবিভাজ্য, তাদের মৌলিক স্বরধ্বনি বলে।

পৃথিবীর সব ভাষাতেই মৌলিক স্বরধ্বনি আছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা নিম্নোক্ত আটটিকে সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনি বলেছেন :

ই (i), এ (e), এ্যা (ε), অ্যা (a), আ (ɤ), অ (a), ও (o), উ (U)।

তবে সব ভাষাতেই এই আটটি স্বরধ্বনিই ব্যবহৃত হয়না। কমবেশী ব্যবহার হচ্ছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন - এগুলি হলো সব ভাষার স্বরধ্বনি চিনবার মান বা নিদর্শন (Standard) অর্থাৎ এই আটটি মৌলিক স্বরধ্বনি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে - সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনি বলে।

সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনি ছিল ১৩টি। তন্মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানে মৌলিক স্বরধ্বনি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ৬টি : অ, আ, ই, উ, এ, ও। কিন্তু বাংলাভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি আছে ৭টি :

অ (a), আ (ɤ), ই (ঈ) (i), উ (উ) (U), এ (e), ও (O), অ্যা (a)।

ভাষাবিজ্ঞানের উচ্চারণ-নিরীখে এগুলি সাজানো হয়েছে :

ই (ঈ) (i), এ (e), অ্যা (a), আ (ɤ), অ (a), ও (O), উ (U)।

■ সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ - উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে

	সমুখ স্বরধ্বনি	কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি	পশ্চাদ স্বরধ্বনি	
উচ্চাবস্থিত	ই		উ	সংবৃত স্বরধ্বনি
উচ্চমধ্য	এ		ও	অর্ধ সংবৃত
নিম্নমধ্য	এ্যা	আ	অ	অর্ধবিবৃত
নিম্নাবস্থিত	অ্যা		(আ)	বিবৃত

সর্বজনীন মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ

জিহ্বার অবস্থান ও ওষ্ঠের আয়তন অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনিগুলিকে তিন শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায় :

এক। (ক) জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী প্রথম প্রকার নামকরণ

১। ‘সম্মুখ স্বরধ্বনি’ : যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ কালে জিহ্বা সাধারণত সামনের দিকে এগিয়ে আসে, তাদের সম্মুখ স্বরধ্বনি (Front Vowel) বলে। যথা - ই, এ, এ্যা, অ্যা।

২। ‘পশ্চাৎ স্বরধ্বনি’ : যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে জিহ্বা সাধারণত পিছনের দিকে যেতে থাকে, তাদের পশ্চাদ স্বরধ্বনি (Back Vowel) বলে। যথা - অ, ও, উ।

৩। ‘কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি’ : সম্মুখ ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনির মাঝে জিহ্বা রেখে যে-স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি (Central Vowel) বলে। যথা - আ।

(খ) জিহ্বার অবস্থান অনুযায়ী দ্বিতীয় প্রকার নামকরণ

১। ‘উচ্চ স্বরধ্বনি’ : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চস্থানে অবস্থান করে, তাদের উচ্চাবস্থিত বা উচ্চ স্বরধ্বনি (High Vowel) বলে। যথা - ই, উ।

২। নিম্ন স্বরধ্বনি : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা নিম্নে অবস্থান করে, তাদের নিম্নাবস্থিত বা নিম্ন স্বরধ্বনি (Low Vowel) বলে। যথা - অ্যা, অা।

৩। ‘উচ্চমধ্য স্বরধ্বনি’ : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা কিছুটা উচ্চে অবস্থান করে, তাদের উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি (High Middle Vowel) বলে। যথা - এ, ও।

৪। ‘নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি’ : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা কিছুটা নিম্নে অবস্থান করে, তাদের নিম্নমধ্য-স্বরধ্বনি (Low Middle Vowel) বলে। যথা - এ্য, অ্য।

---উল্লিখিত উচ্চমধ্য ও নিম্নমধ্য স্বরধ্বনিগুলিকে সাধারণভাবে ‘মধ্যস্বর’ বলা হয়।

দুই। ওষ্ঠের অবস্থা অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ

(১) ‘প্রসৃত স্বরধ্বনি’ : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে ওষ্ঠ দুটিকে কমবেশী প্রসারিত করতে হয়, তাদের প্রসারিত বা প্রসৃত (Retracted) স্বরধ্বনি বলে। যথা - ই, এ, এ্য, অ্যা।

(২) ‘কুঞ্চিত স্বরধ্বনি’ : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে ওষ্ঠ দুটিকে কমবেশী কুঞ্চিত করতে হয়, তাদের কুঞ্চিত (Rounded) স্বরধ্বনি বলে। যথা - অ, ও, উ।

তিন। মুখবিবরের অবস্থান অনুযায়ী মৌলিক স্বরধ্বনির নামকরণ

১। ‘সংবৃত স্বরধ্বনি’ : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের আয়তন সবচেয়ে কম থাকে, তাদের সংবৃত (Closed) স্বরধ্বনি বলে। যথা - ই, উ।

২। ‘বিবৃত স্বরধ্বনি’ : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখবিবরের আয়তন সবচেয়ে বেশী হয়, তাদের বিবৃত (Opened) স্বরধ্বনি বলে। যথা - অ্যা, অ্য।

৩। ‘অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি’ : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবর কিছুটা সংবৃত থাকে, তাদের অর্ধ-সংবৃত (Half-closed) স্বরধ্বনি বলে। যথা - এ, ও।

৪। ‘অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি’ : যে-স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবর কিছুটা বিবৃত (প্রসারিত) থাকে, তাদের অর্ধ-বিবৃত (Half-opened) স্বরধ্বনি বলে। যথা - অ, এ্য ॥

(২) যৌগিক স্বরধ্বনি (Diphthong) : ‘সন্ধ্যক্ষর’/‘দ্বিস্বর’

১। যৌগিক স্বরধ্বনি : সংজ্ঞা

ভিন্ন ভিন্ন দুটি স্বরধ্বনির সাহায্যে গঠিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। এর একাধিক নাম আছে - মিশ্র স্বরধ্বনি, দ্বিস্বরধ্বনি, সন্ধিস্বর, সন্ধ্যক্ষর ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় যৌগিকস্বর প্রধানভাবে ২টি--

ঐ = (অ + ই)। ঔ = (অ + উ)।

-এই ২টি বাংলা বর্ণমালা রক্ষিত হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এইরূপ ২৫টি যৌগিকস্বরের উল্লেখ করেছেন -

যেগুলি (১) বর্ণমালায় প্রদর্শিত হয় নি, (২) যেগুলির ঐ, ঔ এর মতো পৃথক কোনো প্রতীক বা বর্ণ নেই, (৩) যেগুলিকে পাশাপাশি লিখে বা য-কারের সঙ্গে যুক্ত করে প্রকাশ করা হয়।

এগুলি হলো :

অও	অয়,	অআ	
আই	আয়	আউ	আউ
ইয়ে	ইয়া	ইয়ো	ইউ
উই	উয়ে	উয়া	উয়ো
এই	এয়া	এয়ো	এউ
অ্যা	অ্যাও		
ওই	ওয়	ওয়া	ওন।

২. যৌগিক স্বরধ্বনি : বৈশিষ্ট্য

১. যৌগিক স্বরধ্বনি প্রধানত ২টি স্বর দিয়ে গঠিত।
২. যৌগিক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় তার গুনগত চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে।
৩. যৌগিক স্বরে ২টি স্বর-কোনোটিই পূর্ণাঙ্গস্বর নয়। অন্ততঃ দ্বিতীয় স্বরটি পরিপূর্ণ উচ্চারিত হয় না-ভাষাবিজ্ঞানীর মতে তা অর্ধ-উচ্চারিত।
৪. যৌগিক স্বরের মতোই বাংলায় ত্রিস্বর, চতুঃস্বর আছে।
যেমন-আইএ (খাইয়ে দাও), আওয়াই (চাওয়াই যায় না)।
৫. বাংলার বর্ণমালায় ব্যবহৃত প্রধান ২টি যৌগিক স্বরের উচ্চারণ স্থান নিম্নরূপ :
‘ঐ’ - ‘ঐ’ কণ্ঠ ও তালুর সাহায্যে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ ‘ঐ’ উচ্চারণকালে জিহ্বা তালুর গা ঘেঁসে কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়।
সেজন্যে ‘ঐ’ কণ্ঠ-তালব্য বর্ণ।
‘ঔ’ - ‘ঔ’ কণ্ঠ ও ওষ্ঠের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ ‘ঔ’ উচ্চারণকালে জিহ্বা ওষ্ঠের গা ঘেঁসে কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয়।
সেজন্যে ‘ঔ’ কণ্ঠোষ্ঠ্য বর্ণ।
৬. ঐ এবং ঔ-এর রূপ :
ঐ - ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত না-হলে - ঐ; যুক্ত হলে ‘ঐ’ (বৈ)।
ঔ - ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত না-হলে - ঔ; যুক্ত হলে ‘ঐ’ (বৌ)।

৫. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonant) গুলির উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণের প্রকৃতি

১. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণ : সংজ্ঞা

যে-সব ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া নিজেরা উচ্চারিত হতে পারে না, তাদের ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। ভাষাবিজ্ঞানের ভাষায় - যে-ধ্বনি উচ্চারণকালে মুখবিবরের কোথাও না-কোথাও সম্পূর্ণ বাধাপায় কিংবা জিহ্বা, পেশী বা ওষ্ঠের দ্বারা শ্বাসবায়ু বেরোতে গিয়ে সাময়িক বাধা পায়, তাদের ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি মোট ৩৬টি---

ক খ গ ঘ ঙ	প ফ ব ভ ম
চ ছ জ ঝ ঞ	য র ল ব শ
ট ঠ ড ঢ ণ	ষ স হ ড় ঢ় য়
ত থ দ ধ ন	এছাড়া - ২ :

২. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীবিভাগ বা বগীকরণ

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সংস্কৃত ব্যঞ্জনধ্বনির অনুসরণে পরিকল্পিত। তাই এগুলির শ্রেণীবিভাগ বা বগীকরণ যথার্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে উঠেছে। প্রধানত দু-ভাবে এই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির শ্রেণীবিন্যাস করা যায় :

- (এক) ‘উচ্চারণ-স্থান’ অনুসারে,
(দুই) ‘উচ্চারণ-প্রকৃতি’ অনুসারে।

২. (১) ‘উচ্চারণ-স্থান’ অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ :

ব্যঞ্জনধ্বনি মানেই, যে ধ্বনি বাগ্যন্ত্রের কোনো না কোনো স্থানে বাধা পেয়ে বেরিয়ে আসে। মানুষের বাগ্যন্ত্রটি গঠিত হয়েছে অনুক্রমিকভাবে - কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ দিয়ে। বাইরের দিক থেকে দেখলে ঠিক এর উল্টো পর্যায় পাবো - ওষ্ঠ, দন্ত, মূর্ধা, তালু ও কণ্ঠ। নিশ্বাসবায়ু বেরোবার সময় প্রথমে কণ্ঠে, তারপর তালুতে, তারপর মূর্ধায়, তারপর দন্তে এবং সর্বশেষ ওষ্ঠে বাধা পেয়ে বের হয়। তাই এই পারস্পর্য অনুসারেই ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির নামকরণও ঘটেছে। বাংলা বর্ণমালাও তদনুসারে সংগঠিত হয়েছে।।

উচ্চারণস্থান ও ধ্বনির নামকরণ

১। উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল, ধ্বনির নাম জিহ্বামূলীয়ধ্বনি :

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বামূলকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের জিহ্বামূলীয়ধ্বনি বলে। যথা : ক, খ, গ, ঘ, ঙ।
(এদের ক-বর্গও বলা হয়)।

২। উচ্চারণস্থান তালু, ধ্বনির নাম তালব্যধ্বনি :

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি তালুকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের তালব্যধ্বনি বলে। যথা : চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। এছাড়া য, শ ধ্বনিও তালব্যধ্বনি।

৩। উচ্চারণস্থান মূর্ধা, ধ্বনির নাম মূর্ধন্যধ্বনি :

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি মূর্ধাকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের মূর্ধন্যধ্বনি বলে।

যথা : ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। এছাড়া ষ, ঙ, ঞ এই তিনটিও মূর্ধন্যধ্বনি। স্মরণীয় যে, ণ - টির উচ্চারণ বাংলা ভাষায় অনুপস্থিত।

৪। উচ্চারণস্থান দন্ত, ধ্বনির নাম দন্ত্যধ্বনি :

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি দন্তকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের দন্ত্যধ্বনি বলে। যথা - ত, থ, দ, ধ, ন। এ ছাড়া 'স' - দন্ত্যধ্বনি। 'ন' কে অনেকেই দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি বলেন।

৫। উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ, ধ্বনির নাম ওষ্ঠ্যধ্বনি :

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি ওষ্ঠকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের ওষ্ঠ্যধ্বনি বলে। যথা - প, ফ, ব, ভ, ম।

৬। উচ্চারণস্থান দন্তমূল, ধ্বনির নাম দন্ত্যমূলীয়ধ্বনি :

যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি দন্তমূলকে স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের দন্ত্যমূলীয়ধ্বনি বলে। যথা - র, ল।

৭। উচ্চারণস্থান দন্ত ও ওষ্ঠ, ধ্বনির নাম দন্তোষ্ঠ্যধ্বনি :

যে ব্যঞ্জনধ্বনিটি উচ্চারণকালে দন্ত এবং ওষ্ঠ দুটিকেই স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাকে দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনি বলে। সেটি হল - বা।

৮। যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে কণ্ঠকে স্পর্শ করে, তাদের কণ্ঠধ্বনি বলে। যথা হ, ঙ।

২. (২) উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈচিত্র্য ও শ্রেণীবিভাগ :

উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিকে ভাষাবিজ্ঞানীরা নিম্নোক্ত ভাগে বিন্যস্ত করেছেন :

(১) স্পৃষ্টধ্বনি বা স্পর্শবর্ণ (Plosive) :

যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে মুখবিবরের কোনো না কোনো স্থানকে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়, তাদের স্পৃষ্টধ্বনি বা স্পর্শবর্ণ বলে।

যথা :

ক - বর্ণ / ক - ঙ

চ - বর্ণ / চ - ঞ

ট বর্ণ / ট ট ণ

ত - বর্ণ / ত - ন

প - বর্ণ / প - ম

(২) উষ্মধ্বনি (Spirants) :

যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণ কালে বায়ুর আংশিক বাধা পায়, এবং বায়ু বেরিয়ে আসার সময় শিস্ দেবার মতো এক প্রকার ধ্বনি নির্গত হয়, তাদের শিস্ধ্বনি বা উষ্মধ্বনি বলে। যথা : শ, ষ, স, হ।

(৩) ঘৃষ্টধ্বনি (Affricate) :

ঘৃষ্টধ্বনি হল স্পৃষ্টধ্বনি ও উষ্মধ্বনির যৌগিক রূপ। যে সব ব্যঞ্জনধ্বনি প্রথমে স্পর্শ ধ্বনির মতো ও পরে উষ্মধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়, তাদের ঘৃষ্টধ্বনি বলে। যথা : চ, ছ, জ, ঝ। উদাহরণ - চ = ক্ + শ; জ = গ্ + ঙ; ছ = ত্ + স - ছাওয়াল (পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ)।

(৪) নসিক্য বা অনুনাসিকধ্বনি (Nasals) :

যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি উচ্চারণ কালে শ্বাসবায়ু শুধু মুখ দিয়ে বের না-হয়ে মুখ ও নাক উভয় পথ দিয়েই বের হয়, তাদের নাসিক্য বা অনুনাসিক ধ্বনি বলে। যথা : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। এছাড়া ঙ্, ঞ্, ণ্ -এই দুটিও অনুনাসিক ধ্বনি। কিন্তু এরা অন্য কোনো স্বরের সংযোগ ছাড়া উচ্চারিত হয় না (=কংস, চাঁদ)।

(৫) কম্পিত ব্যঞ্জন (Trilled) :

যে ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় জিহ্বার সামনের দিক সামান্য কম্পিত হয় তাকে কম্পিত ব্যঞ্জন বলে। যথা- র।

(৬) তাড়িত ব্যঞ্জন (Flapped) :

যে ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় জিহ্বা দ্বারা দন্তমূল তাড়িত হয়, তাকে বলে তাড়িত ব্যঞ্জন। যথা - ড, ঢ (ষাড, রাঢ়)। ড, ঢ উচ্চারণের সময় মনে হয় জিহ্বার অগ্রভাগের উল্টো দিক যেন মূর্ধা থেকে নীচের দাঁতের উপর আছড়ে পড়ছে - একেই বলছি তাড়না। সংস্কৃতে ড, ঢ ছিল না। ছিল ড, ঢ। বাংলায় এ দুটি নতুন।

(৭) পার্শ্বিক ধ্বনি (Lateral) :

যে ধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বার দুপাশ দিয়ে বায়ু নির্গত হয়, তাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। যথা - ল (মলয়, লতা)।

(৮) অন্তঃস্থ ধ্বনি :

যে ধ্বনিগুলি স্পর্শধ্বনি ও উন্মথধ্বনির মধ্যে অবস্থান করে, তাদের অন্তঃস্থধ্বনি বলে। যথা- য, র, ল, বা। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন - এদের কোনোটিই পূর্ণ ব্যঞ্জনধ্বনি নয়।

ক) ‘য’ (য = y), ‘ব’ (ব = w) হলো ‘অর্ধস্বর’।

খ) ‘র’, ‘ল’ হলো - তরল ধ্বনি। এ দুটি ‘অর্ধ-ব্যঞ্জন’

২. (৩) উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে অতিরিক্ত আরেক ভাবেও শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায় :**১। ঘোষ (সঘোষ) ধ্বনি (Voiced Sound) :**

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে সেই ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীক কম্পনজাত সুর বা ঘোষ মিশে থাকে, তাকে ঘোষ বা সঘোষ বা ঘোষবৎ ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

যথা : বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ বা ধ্বনি।

ক - বর্গের - গ ঘ ঙ। ত - বর্গের - দ ধ ন।

চ - বর্গের - জ ঝ ঞ। প - বর্গের - ব ভ মা।

ট - বর্গের - ড ঢ ণ। (বাংলার ড ঢ = ঘোষধ্বনি)

২। অঘোষ ধ্বনি (Voiceless/Breathed Sound) :

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণকালে সেই ধ্বনির সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর কোনো কম্পনজাত সুর মিশে থাকে না, তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে।

যথা : বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি

ক - বর্গের - ক, খ। ত - বর্গের - ত, থ।

চ - বর্গের - চ, ছ। প - বর্গের - প, ফ।

ট - বর্গের - ট, ঠ।

স্মর্তব্য : ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন সঘোষ ধ্বনিগুলি ফিস্ফিস্ করে বললে অঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। এই ঘোষ এবং অঘোষ উভয়প্রকার ধ্বনিগুলিকে দুভাবে ভাগ করা যায় : (ক) মহাপ্রাণ। (খ) অল্পপ্রাণ।

(ক) মহাপ্রাণ (Aspirated) ধ্বনি :

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীতে উদ্ভিত হ ধ্বনি (মহাপ্রাণতা) মিশে থাকে, তাকে মহাপ্রাণধ্বনি বলে। (মহাপ্রাণধ্বনি উচ্চারণের সময় ‘প্রাণ’ বা শ্বাসবায়ু জোরে বেরোয় ও অধিক পরিমাণে বেরোয়)।

যেমন : খ উচ্চারণে - উচ্চারিত হয় ক + হ মিলিয়ে।

তেমনি : ঘ উচ্চারিত হয় - গ্ + হ মিলিয়ে।

তেমনি : ছ = চ্ + হ। ঝ = জ্ + হ। ঠ = ট্ + হ। ঢ = ড্ + হ। থ = ত্ + হ।

বর্গের ২য় ও ৪র্থ ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে :

ক - বর্গের - খ, ঘ। ত - বর্গের - থ, ধ।

চ - বর্গের - ছ, ঝ। প - বর্গের - ফ, ভ।

ট - বর্গের - ঠ, ঢ।

(খ) অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Un-aspirated) :

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীতে উদ্ভিত হ ধ্বনি (মহাপ্রাণতা) মিশে থাকে না, তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। অল্পপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় ‘প্রাণ’ বা শ্বাসবায়ু ধীরে ও কম পরিমাণে বেরোয়)।

যথা : বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি :

ক - বর্গের - ক, গ। ত - বর্গের - ত, দ।

চ - বর্গের - চ, জ। প - বর্গের - প, ব।

ট - বর্গের - ট, ড।

বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ :

ব্যঞ্জন ধ্বনি					স্বরধ্বনি	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ধ্বনির নামকরণ		
স্পর্শধ্বনি								অন্তস্থ ধ্বনি	উষ্মধ্বনি
অঘোষধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		নাসিক্য					
অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ	অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ						
					ঃ, হ		কণ্ঠ	কণ্ঠ্যধ্বনি	
ক	খ	গ	ঘ	ঙ		অ, আ	জিহ্বামূল	জিহ্বামূলীয়ধ্বনি	
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ		ই, ঈ, এ, ঐ	তালু	তালব্যধ্বনি	
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ		ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্যধ্বনি	
		ড়	ঢ়				মূর্ধা ও দন্তমূল	মূর্ধন্য-দন্তমূলীয়ধ্বনি	
				ন	র, ল	স	দন্তমূল	দন্তমূলীয়ধ্বনি	
ত	থ	দ	ধ				দন্ত	দন্ত্যধ্বনি	
প	ফ	ব	ভ	ম		উ, ঊ, ও, ঔ	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্যধ্বনি	

১.৫.২ অক্ষর গঠনের প্রকৃতি :

লিপি হলো মানুষের মুখের ভাষার এমন রূপায়ন যাকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়, যাকে এক কাল থেকে অন্যকালের জন্য রেখে দেওয়া যায়।

এই রূপায়ন সাধন করতে গিয়ে যে ভাষা ছিল মূলত মুখে বলার ও কানে শোনার জিনিস, মানুষ লিপির মাধ্যমে সেই ভাষাকে করেছে চোখে দেখার জিনিস, পড়ার জিনিস অর্থাৎ যেটা ছিল মূলত শ্রব্য, সেটাকে সে করেছে দৃশ্য। সুতরাং বলতে পারি লিপি হলো উচ্চারিত ধ্বনির দৃশ্য রূপায়ন যা স্থানান্তর যোগ্য এবং সংরক্ষণ যোগ্য।

লিপির গুরুত্ব :

মানব সভ্যতার ধারক ও বাহকের এক অন্যতম মাধ্যম হলো লিপি। মানুষের জ্ঞান সাধনার সম্পদকে তার ভাব ভাবনার ফলগুলি দশজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য তাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে। মুখের ভাষা সীমাবদ্ধ, - বহুদূরের মানুষকে বা অন্যকালের মানুষকে মুখের ভাষায় জানানো সম্ভব নয় বা সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র লিপির মাধ্যমেই তা প্রকাশ করা সম্ভব। লিপিবদ্ধ দলিলের মধ্যে পড়ে প্রত্নলিপি, সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ক পাণ্ডুলিপিগ্রন্থ ইত্যাদি এইগুলির মধ্যে ভাষার রূপ বৈশিষ্ট্য ও ক্রমবিবর্তন চিহ্ন বিধৃত থাকে।

লিপির উদ্ভব ও স্তরভেদ : বাংলা লিপির উৎস ও ক্রমবিকাশ :

আদিমকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত লিপির যে ক্রমবিকাশ তাতে মোটামুটিভাবে চারটি স্তরে দেখতে পাই। এই স্তরগুলি হলো - চিত্রলিপি, ভাবলিপি, চিত্রপ্রতীক লিপি এবং ধ্বনিলিপি।

(ক) চিত্রলিপি : খ্রীঃ পূঃ ২০,০০০ - ১০,০০০ এর মধ্যবর্তীকালে মানবসভ্যতার যখন বিকাশ ঘটেছিল তখন মানুষ তার জীবনের বীরত্বকাহিনীকে ও তার চোখে দেখা ও মনে দাগ কাটা জিনিস গুলির ছবি ঐক্য মনের স্মৃতিকে বাইরে প্রকাশ করতো। দেওয়ালে, পর্বতগাত্রে, গাছের গুঁড়িতে দাগ কেটে, রেখোচিত্র বা ছবির মাধ্যমে মানুষ তার জন্তু শিকারের ঘটনা, প্রানী বস্তুর রূপ ঐক্য রাখত। এই অনুন্নত স্মারক চিত্র পদ্ধতি এখনো আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

(খ) ভাবলিপি :

চিত্রলিপির শেষ পর্বে চিত্রাঙ্কন অপেক্ষাকৃত সরলীকৃত হয়ে এসেছিল। তখন কোনো জিনিসের পুরো ছবি না ঐক্য কয়েকটি রেখার সাহায্যে সংক্ষেপে জিনিসটি বুঝিয়ে দেওয়া হতো এর পরের ধাপে রেখাচিত্র ক্রমে কোন বস্তুকে না বুঝিয়ে বিশেষ ভাবে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হত। ভাবলিপি কলিফোর্নিয়াতে পাওয়া যায়।

(গ) চিত্রপ্রতীক লিপি :

চিত্র প্রতীকলিপি স্তরে অঙ্কিত চিত্রগুলি উপস্থাপ্য বস্তু বা ভাবের প্রতীক না হয়ে সেই উপস্থাপ্যবস্তু বা ভাবের নামবাচক শব্দ বা ধ্বনি সমষ্টির প্রতীক হয়ে উঠল। যেমন - একটি লোক তার মুখের কাছে হাত এনে বলে আছে - এ ছবিটি 'wnm'- শব্দটির প্রতীক ছিল। আর এই শব্দের অর্থ ছিল খাওয়া। ধীরে ধীরে চিত্রপ্রতীক লিপি ধ্বনি লিপিতে উদ্ভূত হলো।

(ঘ) ধ্বনি লিপি :

চিত্র প্রতীকগুলি যখন বস্তু বা ক্রিয়ার প্রতীক না হয়ে ধ্বনিগুচ্ছের প্রতীক হয়ে উঠলে তখন লিপি হয়ে উঠল ধ্বনিলিপি। এই ধ্বনিলিপিরও কয়েকটি স্তর আছে। ধ্বনিলিপির প্রথমস্তরে একটি প্রতীকের মাধ্যমে একটি শব্দকে বা একাধিক ধ্বনির সমবায়কে বোঝাতো। ধ্বনির এই প্রথম স্তরের নাম শব্দ লিপি।

পরবর্তীকালে শীর্ষনির্দেশ (Acrology) আরও সরলীকৃত হয়ে যে লিপি পদ্ধতির জন্ম হলো তাকে বলে অক্ষর লিপি। অক্ষর হলো নিঃশ্বাসের এক ধাক্কা যতটা উচ্চারিত হয়, ততটা ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। অক্ষর লিপিতে এক একটি রেখাচিত্র এক একটি অক্ষরের প্রতীক হয়ে উঠল

যেমন - ক = (ক + অ)।

বাংলা স্বরবর্ণ নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারলেও বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ নিজে থেকে উচ্চারিত হতে পারে না। তাই রোমানীয় লিপি কেবলমাত্র বর্ণলিপি হলেও বাংলা লিপি কিছু অক্ষর লিপি এবং কিছু ধ্বনি লিপির সমন্বয়ে গঠিত। যেমন - বাংলা অক্ষর লিপি - ক = ক্ + অ

খ = খ্ + অ

গ = গ্ + অ ইত্যাদি।

বাংলা ধ্বনিলিপি বা বর্ণলিপি :-

অ, আ, ই, ঈ, উ ইত্যাদি।

এভাবে চিত্রলিপি, ভাবলিপি; চিত্রপ্রতীক, শব্দ লিপি, অক্ষরলিপি ও বর্ণলিপির মাধ্যমে ধাপে ধাপে অন্যান্য আধুনিক লিপির মতো বাংলা লিপিরও উদ্ভব হয়েছে।

১.৫.৩ ধ্বনিপরিবর্তন :**১। 'ধ্বনি' (Sound)**

মানুষের ইচ্ছায়, তার গলা থেকে নিঃসৃত স্বর, বায়ুস্তরে শোনার মতো যে স্পন্দন তোলে, তাকে বলে ধ্বনি।

যেমন - অ, আ, ই, ঈ, উ, এ, ঐ, ক, গ, শ - এদের উচ্চারণটুকুই 'ধ্বনি'। কথা বলা বা গান করার সময় আমাদের গলা থেকে স্বর বের হয়। তা বেরিয়ে বায়ুতে আঘাত করে। তাতে যা উৎপন্ন হয়, তা-ই 'ধ্বনি'। 'ধ্বনি' আমরা কানে শুনি, চোখে দেখি না। অবশ্যই ভাষা ও ছন্দ-বিজ্ঞানে পশু পাখির ডাক বা পদার্থের আঘাতে সৃষ্ট ধ্বনিকে 'ধ্বনি' বলে না। সেখানে একমাত্র মানুষের কণ্ঠ জাত ধ্বনিই 'ধ্বনি'। সুতরাং 'ধ্বনি' হলো মানুষের কণ্ঠ জাত, মানুষের ইচ্ছায় সৃষ্ট, মানুষের শ্রুতিগ্রাহ্য। তার রূপ নেই, তবে প্রতীক দিলে তার নাম হবে 'বর্ণ'।

'ধ্বনি' দু-প্রকার - 'স্বরধ্বনি' ও 'ব্যঞ্জন ধ্বনি'।

(ক) যে-ধ্বনি মানুষের গলা থেকে স্বভাবিকভাবে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন - অ আ ই ঈ প্রভৃতি।

(খ) যে-ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন - ক খ গ ঘ ঙ প্রভৃতি।

২। ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

ভাষা নদীর স্রোতের মতো। নদীর মতোই সে প্রবাহমান। নিজেকে সর্বদাই সে সজীব রেখে চলেছে। নদীর মতোই সে গতিপথ বদলে দেয়। এই রূপ-বদলের মূলে আছে তার 'ধ্বনি' গুলির পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন প্রথম দেখা যায় মানুষের মুখের ভাষায়। যেমন - 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসে গদাধর চন্দ্র বলেছে :

'ডুডুও খাবো, টামাকও খাবো'।

ধ্বনিপরিবর্তনের এ এক চমৎকার উদাহরণ। আসল ধ্বনি ছিল - দধুও খাবো, তামাকও খাবো। এখানে 'দু' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'ডু' হয়েছে, 'ধ' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'ডু' হয়েছে, 'তা' ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'টা' হয়েছে। এই হলো ধ্বনি পরিবর্তন।

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণ অনেক। কিন্তু এই কারণ গুলি সব ভাষার ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য নয়। বাংলা ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের যে-কারণ গুলি আছে, ইংরেজি বা ফরাসী ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের পেছনে সে কারণ গুলি প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে স্বীকার্য যে, ধ্বনিপরিবর্তনের পেছনে সর্বাধিক দায়ী ধ্বনি উচ্চারণ-কারী মানুষ।

৩. ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা ও চারটি সূত্র

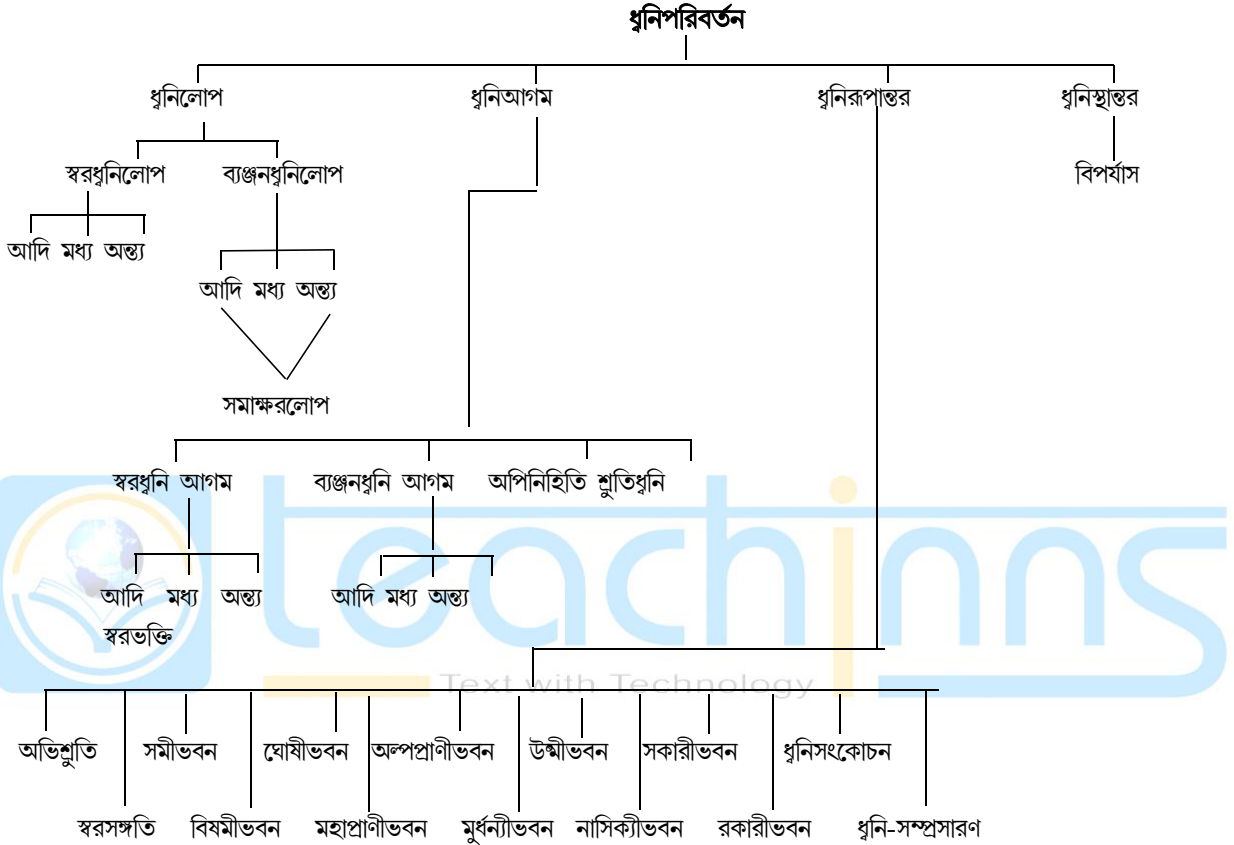
যে কোনো ভাষার পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, সেখানে বহু বিচিত্র ভাবেই ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে। কিভাবে, কোন্ পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ঘটেছে, ভাষা-বিজ্ঞানীরা সে-নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। এ-বিষয়ে তাঁরা চারটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। সেগুলি হলো :

এক ॥ ধ্বনি লোপ।

দুই ॥ ধ্বনি আগম।

তিন ॥ ধ্বনি রূপান্তর।

চার ॥ ধ্বনি স্থানান্তর।



এক ॥ ‘ধ্বনি লোপ’

শব্দ উচ্চারণের সময় ‘শ্বাসাঘাত’, ‘দ্রুততা’, ‘অসাবধানতা’ ও ‘অনুকরণ ত্রুটি’-র জন্যে শব্দের কোনো কোনো ধ্বনি স্থলিত হয়ে পড়ে, ক্রমশঃ তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। একেই বলে ‘ধ্বনি লোপ’। ধ্বনি লোপ দুই প্রকার - (অ) স্বরধ্বনি লোপ, (আ) ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ। ধ্বনি লোপের আর একটি সূত্র - সমধ্বনি লোপ বা সমাক্ষর লোপ।

(অ) স্বরধ্বনি-লোপ :

স্বরধ্বনি লোপ তিন প্রকার - আদিস্বর-লোপ, মধ্যস্বর-লোপ ও অন্ত্যস্বর-লোপ।

১. আদিস্বর-লোপ :

কোনো কোনো সময় আদি ছাড়া অন্যস্বরে শ্বাসাঘাত পড়লে, আদি স্বরটি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে এক সময় লোপ হয়ে যায়। একে বলে আদিস্বর-লোপ।

যেমন : ওঝা > ঝা। উদ্ধার > ধার। আছিল > ছিল। আলাবু > লাউ।

২. মধ্যস্বর-লোপ :

কখনো কখনো শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাত পড়লে, শব্দের মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি দুর্বল হয়ে ক্রমশঃ লোপ পায়। একেই বলে মধ্যস্বর-লোপ।

যেমন : গামোছা > গাম্ছা। কলিকাতা > কলকাতা। নাতিজামাই > নাত্জামাই।

ভগিনী > ভগ্নী।

৩. অন্ত্যস্বর-লোপ :

কখনো কখনো শব্দের আদি অক্ষরে প্রবল শ্বাসঘাত পড়লে, অন্ত্যস্বর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে লোপ পায়। তাকেই অন্ত্যস্বর লোপ বলে।

যেমন : ভিন্ন > ভিন। রাশি > রাশ। নিত্য > নিত। অগ্র > আগ।

(আ) ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ :

ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের উদাহরণ দুর্লভ। যদিও বা মধ্যব্যঞ্জন লোপের উদাহরণ দু-চারটি মেলে, আদি ও অন্ত্য ব্যঞ্জন লোপের নিদর্শন পাওয়া দুষ্কর। তবুও পন্ডিতেরা কিছু উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন -

১. আদিব্যঞ্জন লোপ - শ্মশান > মশান, স্থিত > থিত, স্থান > থান।
২. মধ্যব্যঞ্জন লোপ - পাটকাঠি > পাকাঠি, শৃগাল > শিআল। ফলাহার > ফলার।
৩. অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ - সখী > সহ। নাহি > নাই। গাত্র > গা। বড়দাদা > বড়দা। বউদিদি > বউদি।

(ই) সমাক্ষরলোপ : পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমঅক্ষর বা সমধ্বনির একটি লোপ পেলে সমাক্ষর লোপ পায়। যেমন -

বড়দাদা > বড়দা। ছোট কাকা > ছোটকা।

মুখখানি > মুখানি। লৌকিকতা > লৌকিতা। পটললতা > পলতা।

দুই ।। ‘ধ্বনি-আগম’

উচ্চারণে সরলতা বা সৌন্দর্য আনার জন্য অনেক সময় শব্দের আদি, মধ্য বা অন্তে স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনির আগম ঘটে, তাকেই বলে ‘ধ্বনি-আগম’। ধ্বনি আগম দুই প্রকার (অ) স্বরধ্বনির আগম; (আ) ব্যঞ্জনধ্বনির আগম।

(অ) স্বরধ্বনির আগম :

উচ্চারণের সুবিধার জন্যে শব্দের কোনো স্থানে স্বরের আগমনকে স্বরধ্বনি আগম বলে। স্বরধ্বনি আগম তিন প্রকার :

১. আদি স্বরাগম
২. মধ্য স্বরাগম বা স্বরভক্তি
৩. অন্ত্যস্বরাগম।

১. আদি স্বরাগম :

শব্দের আদিতে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে, কখনো কখনো তার উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য তার আগে একটি স্বরধ্বনি এসে যায়। তাকেই আদিস্বরাগম বলে।

যেমন : স্পর্ধা > আস্পর্ধা। স্কুল > ইস্কুল। ক্ষু > ইক্ষুপা। স্ত্রী > ইস্ত্রিরি।

স্টেশন > ইস্টেশন। স্পিরিট > ইস্পিরিট।

২. মধ্য স্বরাগম বা স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ :

উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য কখনো কখনো শব্দের মধ্যবর্তী যুক্তব্যঞ্জন ভেঙ্গে তার মধ্যে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে, মধ্যস্বরাগম হয়। একেই স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে।

যেমন : ভক্তি > ভকতি। মুক্তা > মুকুতা। কর্ম > করম। ফিল্ম > ফিলিম।

শ্লোক > শোলোক। প্রীতি > পিরীতি।

৩. অন্ত্যস্বরাগম :

উচ্চারণ সৌকর্যের জন্য শব্দের অন্তে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে তাকে আন্ত্যস্বরাগম বলে।

যেমন : পিন্ড > পিন্ডি। দুষ্ট > দুষ্টী। বেঞ্চ > বেঞ্চি। নস্য > নস্যি। সত্য > সত্যি। কড়া > কড়াই।

(আ) ব্যঞ্জনধ্বনির আগম : উচ্চারণ সুবিধার জন্য শব্দের কোনো কোনো স্থানে ব্যঞ্জনধ্বনি আগম হলে তাকে ব্যঞ্জনাগম বা ব্যঞ্জনধ্বনি আগম বলে। তবে স্বরধ্বনি আগমের মতো ব্যঞ্জনধ্বনির আগম বেশী মেলে না - কিন্তু বিরল নয়। শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনাগম প্রচুর।

১. আদি ব্যঞ্জনাগম - ওজা > রোজা। উই > রুই। উপকথা > রূপকথা। ওমলেট > মামলেট।

২. অন্ত্যব্যঞ্জনাগম - নানা > নানান। বহু > বহুল। জমি > জমিন। সীমা > সীমানা। বাবু > বাবুন। খোকা > খোকন।

(ই) অপিনিহিতি (Epenthesis) :

শব্দের মধ্যে ‘ই’ বা ‘উ’ থাকলে, সেই ‘ই’ বা ‘উ’ যথা-নির্দিষ্ট স্থানের আগেই উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন :

১. ‘ই’ কারের অপিনিহিতি : রাতি > রাইত। আজি > আইজ। করিয়া > কইর্যা। গাঁট > গাঁইট। পাখি > পাইখ। চারি > চাইর।
২. ‘উ’ কারের অপিনিহিতি : সাধু > সাউধ। মাথুয়া > মাউথুয়া। মাছুয়া > মাউছুয়া। নাটুয়া > নাউটুয়া। মাঠুয়া > মাউঠুয়া। ভাতুয়া > ভাউতুয়া।

অপিনিহিতি নামটি দেন ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। উক্ত সংজ্ঞাটিও তাঁরই দেওয়া। পশ্চিমবাংলা ‘রাঢ়ী’ উচ্চারণে এখন অপিনিহিতি মেলে না। এখন বাংলাদেশের লোকদের মৌখিক উচ্চারণে অপিনিহিতি প্রচুর। তবে রাঢ়েও যে একদা অপিনিহিতি ছিল, তার প্রমাণ মেলে মুকুন্দের চডীমঙ্গলে : ‘কার সনে দ্বন্দ্ব ‘কইর্যা’ চক্ষু কৈলা রাতা।’ কিংবা লোচন দাসের গানে : ‘আঁখির জলে বুক ভিজিল ‘ভাইস্যা’ গেল পাটা।’

৩. সুকুমার সেন বলেন, যুগ্ম-ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে ‘ই’কার আগম হলে অপিনিহিতি হয়। যেমন : বাক্য > বাইক্য। লক্ষ > লইকখ। যক্ষ > যইগগৌ ইত্যাদি।

(ঈ) ‘শ্লুতিধ্বনি’ (Glide) :

পাশাপাশি দুটি ধ্বনির উচ্চারণ কালে, অসাবধানতাহেতু কিংবা উচ্চারণ-সৌকর্যের জন্যে, ঐ দুটি ধ্বনির মাঝখানে তৃতীয় একটি ধ্বনি এসে গেলে, তাকে শ্লুতিধ্বনি বলে। যেমন -

শৃগাল > শিআল > শিয়াল। এখানে প্রথমে ‘গ’ - এর লোপ, পরে ‘য়’ এর আগম। তেমনি বানর > বান্দর (প্রা-বাং, এখানে ‘দ’- এর আগম) > বান্দর (আ. বাং- চন্দ্রবিন্দুর (ঁ) আগম।

শ্লুতিধ্বনি প্রধানত দু রকম - ‘য়’ শ্লুতি ও ‘ব’ শ্লুতি। এছাড়া ‘দ’, ‘ল’ প্রভৃতি শ্লুতিও আছে।

(১) য-শ্লুতি : দুই ধ্বনির মাঝে ‘য়’ - এর আগম ঘটলে ‘য়’ শ্লুতি। যেমন - সাগর > সাঅর > সায়র। লোহ > নোয়া।

এখানে ল > ন উচ্চারিত হয়েছে। ‘হ’ লোপ পেয়ে, অ এসেছে। সেই ‘অ’ > ‘য়’ হয়েছে।

(২) ব-শ্লুতি : দুই ধ্বনির মাঝে ‘ব’ - এর আগম ঘটলে ‘ব’ শ্লুতি হয়। তবে বাংলায় অন্তঃস্থ ‘ব’ নেই বলে লেখা হয় - উঅ, ওঅ, ওয়া যেমন, যা + আ = যাওয়া (এখানে যথার্থ বানান হওয়া উচিত ছিল ‘যাবা’। তেমনি - শূকর > শূঅর > শূওর, শূয়ার। এছাড়া :

(৩) ‘হ’ আগম হলে হ শ্লুতি। - বেয়ারা > বাহার, রাজকুল > রাউল > রাহুল।

(৪) ‘দ’ আগম হলে ‘দ’ শ্লুতি। - বানর > বান্দর, জেনারেল > জাঁদরেল।

(৫) ‘র’ আগম হলে ‘র’ শ্লুতি। - পুষ্ট > পুরুষ্ট।

তিন ।। ধ্বনিরূপান্তর

শব্দের মধ্যে যদি কোনো স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি স্থান পরিবর্তন করে, বা একটি অপরের সঙ্গে বিনিময় করে, তখন তাকে ধ্বনিরূপান্তর বলে। ধ্বনিরূপান্তর বহু রকম।

**(১) অভিশ্রুতি (Umlaut) :**

অপিনিহিতির পরের স্তর হলো অভিশ্রুতি। অপিনিহিতির ‘ই’ বা ‘উ’ ধ্বনি যদি লোপ পায় কিংবা অন্য স্বরের প্রভাবে নব রূপ পায়, অথবা স্বরের সঙ্গে মিশে নতুন রূপ পায় - তবে তাকে ‘অভিশ্রুতি’ বলে।

যেমন - করিয়া > কইর্যা > করে। এখানে অভিশ্রুতির ‘কইর্যা’র ‘অ’ এবং ‘ই’ পাশাপাশি থাকায় পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে ও সন্ধিবদ্ধ হয়ে ‘এ’ - কারে নবরূপ পাচ্ছে।

তেমনি :

মূলশব্দ > অপিনিহিতি > অভিশ্রুতি।

কালি	কাইল	কাল	বগিয়া > বাইন্যা > বেনে
রাতি	রাইত	রাত	চলিয়া > চাইল্যা > চলে
বাদিয়া	বাইদ্যা	বেদে	আসিয়া > আইস্যা > এসে

(২) ‘স্বরসঙ্গতি’

যদি শব্দের মধ্যে পশাপাশি দুটি পৃথক স্বরধ্বনি থাকে এবং তাদের একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে বা দুটিই দুটিকে প্রভাবিত করে একই রকম (প্রায় একই রকম) স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে ‘স্বরসঙ্গতি’ বলে।

যেমন - বিলাতি > বিলিতি - এখানে ‘আ’ ও ‘ই’ পশাপাশি থাকায়, ‘ই’ ‘আ’কে প্রভাবিত করেছে। এবং ‘আ’ সঙ্গতি লাভ করে ‘ই’ তে রূপান্তরিত হয়েছে। - এই হলো স্বরসঙ্গতি।

স্বরসঙ্গতি চার রকমের - ‘প্রগত’, ‘পরাগত’, ‘মধ্যগত’ ও ‘অন্যান্য’।

(ক) প্রগত - পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গতি। মিথ্যা > মিথ্যে, হিসাব > হিসেব, তিনটি > তিনটে।

(খ) পরাগত - পরবর্তী স্বরের সঙ্গে পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গতি। সন্ন্যাসী > সন্নিস, দেশী > দিশি, পিছন > পেছন।

(গ) মধ্যগত - পূর্ব বা পরবর্তী স্বরের প্রভাবে মধ্য স্বরের সঙ্গতি। নিড়ানি > নিড়ুনি, বিলাতি > বিলিতি, বারান্দা > বারেন্দা।

(ঘ) অন্যান্য - পূর্ববর্তী স্বরের পারস্পরিক প্রভাবে পারস্পরিক পরিবর্তন। যেমন - শেফালি > শিউলি। শোনা > শুনা।

বাদলিয়া > বাদুলে। নাটকিয়া > নাটুকে।

(৩) ‘সমীভবন’ (Assimilation) :

‘সমীভবন’ হলো ব্যঞ্জনসংগতি। যদি শব্দের মধ্যে পশাপাশি দুটি পৃথক ব্যঞ্জনধ্বনি থাকে, এবং তাদের একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে, বা দুটিই দুটিকে প্রভাবিত করে একই রকম (বা প্রায় একই রকম) ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে সেই প্রক্রিয়াকে ‘ব্যঞ্জনসঙ্গতি বা সমীভবন’ বলে।

সমীভবন তিন রকমের - ‘প্রগত’, ‘পরাগত’, ‘অন্যান্য’।

(ক) প্রগত - পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গতি - পদ্ম > পদ্ম। ব্যঞ্জন > ব্যন্নন। পক্ক > পক্ক। চক্র > চক্র।

(খ) পরাগত - পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গতি। পোতদার > পোদদার, গল্প > গপ্পা। কর্পূর > কর্পূর।

(গ) অন্যান্য - পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ব্যঞ্জনের পারস্পরিক প্রভাবে পারস্পরিক পরিবর্তন। যেমন - বৎসর > বছর। মৎস্য >

মচ্ছ, মহোৎসব > মোচ্ছব। মেঘ > মেকেরেছে।

(৪) বিষমীভবন (Dissimilation) :

সমীভবনের উল্টো প্রক্রিয়ার নাম ‘বিষমীভবন’। যদি শব্দের মধ্যে পশাপাশি অবস্থিত দুটি সমধ্বনির মধ্যে একটি পরিবর্তিত হয়ে বিষম বা পৃথক ধ্বনিতে রূপ পায়, তবে তাকে বিষমীভবন বলে।

যেমন - লাল > নাল। বিষমীভবনের উদাহরণ নেই বললেই চলে। তবে ডঃ সুকুমার সেন উদাহরণ দিয়েছেন ‘পোতুগীজ শব্দ ‘আর্মারিও’ (Armario) থেকে বাংলা ‘আলমারী’। সংস্কৃত ‘মর্ত্য’ > উড়িয়ে ভাষার বিষমীভবন - ‘মঞ্চ’। ‘ললাট’ > ‘ললাড’।

(৫) ঘোষীভবন (Voicing) :

অঘোষধ্বনি যদি সঘোষ হয়, তাহলে ঘোষীভবন হয়। যেমন - উপকার > উবগার, কাক > কাগ, কতদূর > কদূর, ছোটদা > ছোড়দা।

(৬) অঘোষীভবন (Deroicing) :

সঘোষধ্বনি যদি অঘোষ হয়, তাহলে অঘোষীভবন হয়। যেমন - অবসর > অপসর, ছাদ > ছাত, পাপড়ি > পাবড়ি, বড়ঠাকুর > বটঠাকুর (ভাসুর)।

(৭) মহাপ্রাণীভবন (Aspiration) :

বর্ণের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ বা ধ্বনি এবং ‘হ’ বর্ণ হলো মহাপ্রাণবর্ণ। মহাপ্রাণবর্ণের প্রভাবে অল্পপ্রাণবর্ণ যদি মহাপ্রাণবর্ণের মতো উচ্চারিত হয়, তবে তাকে মহাপ্রাণীভবন বলে। যেমন - পাশ > ফাঁস। বিবাহ > বিভা। স্তম্ভ > থাম।

(৭) (ক) স্বতঃমহাপ্রাণী ভবন (Spontaneous Aspiration) :

মহাপ্রাণধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যদি কোনো অল্পপ্রাণধ্বনি মহাপ্রাণিত হয়, তখন তাকে স্বতঃমহাপ্রাণীভবন বলে। যেমন - পুস্তক > পুঁথি (এখানে ত > থ, কোনো মহাপ্রাণধ্বনির প্রভাব নেই)। তেমনি - জীর্ণ > ঝুণা, ক্রীড় > খেলা, কিশিৎ > কিছু।

(৮) অল্পপ্রাণীভবন (De-aspiration) :

মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণধ্বনিতে পরিণতি হলে, অল্পপ্রাণীভবন হয়। যেমন - করছি > কচ্ছি, দুধ > দুদ। শৃঙ্খল > শিকল। হস্ত > হথ > হাত। মহার্ঘ > মাগ্গি।

(৯) মূর্ধনীভবন (Cerebralisation) :

ঋ, র, ষ - এর প্রভাবে দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে পরিণত হলে মূর্ধনীভবন হয়। যেমন - মৃত্তিকা > মাটি, ক্ষুদ্র > খুড়া, বৃদ্ধ > বুড়া, চতুর্থ > চৌঠা।

(৯) (ক) স্বতোমূর্ধনীভবন :

কারো প্রভাব ছাড়াই দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্যবর্ণে রূপ পেলে স্বতোমূর্ধনীভবন হয়। যেমন - বালতি > বালটি। পতঙ্গ > ফড়িং। পততি > পড়ই > পড়ে।

(১০) উষ্মীভবন (Spirantisation) :

ধ্বনিউচ্চারণ কালে (ক) শ্বাসবায়ু পূর্ণ বাধা পেলে স্পর্শধ্বনি (= ক-ম) হয়, (খ) আংশিকবাধা পেলে উষ্মধ্বনি (= শ ষ স হ) হয়। কিন্তু (গ) স্পর্শধ্বনি উচ্চারণে যদি পূর্ণ বাধা না-পায় - আংশিক বাধাপায়, তবে সেই স্পর্শধ্বনি উষ্মধ্বনিতে রূপ পায়। একেই বলে উষ্মীভবন। প্রধানত চট্টগ্রামী উপভাষায় উষ্মীভবন লক্ষ্য করা যায় (রাঢ়ী উচ্চারণে নেই)। যেমন - কালীপূজা > খা. লী. ফু. জা (Xalifuza), ফুল (Phul) > ফুল (fool), বাদাম > বা. দা. ম।

(১১) নাসিকীভবন (Nazalisation) :

নাসিক্যধ্বনি (= ঙ ঞ ণ ন ম) যদি নিজে লুপ্ত হয় এবং পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে তোলে, তাহলে তাকে নাসিকীভবন বলে। যেমন - হংস > হাঁস, দন্ত > দাঁত, সন্ধ্যা > সাঁজ।

(১১) (ক) স্বতোনাসিকীভবন :

নাসিক্যধ্বনির লোপ বা প্রভাব ছাড়াই যদি অকারণে কোনো ধ্বনি অনুনাসিক হয়ে ওঠে, তবে তাকে স্বতোনাসিকীভবন বলে। যেমন - পুষ্পক > পুঁথি। ইষ্টক > ইঁটা। পেচক > পৈঁচা, যুথী > জুঁই, সূচ > ছুঁচ। হাসপাতাল > হাঁসপাতাল।

(১২) সকারীভবন (Assibilation) :

উষ্মীভবনের জন্য যদি পৃষ্ঠ বা ঘৃষ্ঠধ্বনি স (s) শ (f) জ (r) -তে পরিণত হয়, তবে তাকে সকারীভবন বলে। প্রধানত পূর্ববঙ্গের একটি উপভাষাতেই সকারী ভবনের ছড়াছড়ি। যেমন - খেয়েছে > খাইসে, গাছ > গাস, আছে > আসে।

(১৩) রকারীভবন (Photacism) :

‘স’ (s) যদি প্রথমে ‘জ’ (z) এবং পরে ‘র’ (r) - তে পরিণত হয়, তাকে রকারীভবন বলে। যেমন - দ্বাদশ > দুবাজস > বারস > বারহ > বার; পঞ্চদশ > পন্নডহ > পনর।

(১৪) ধ্বনি-সংকোচন (Contraction) :

দ্রুত উচ্চারণে কোনো কোনো সময় শব্দের সবকটি ধ্বনিই আমরা উচ্চারণ করি না - কিছু ধ্বনি মিলে তার সংক্ষিপ্ত রূপ উচ্চারণ করি। একে বলে ধ্বনি সংকোচন। যেমন - যাহা ইচ্ছা তাই = যাচ্ছেতাই, বাঁকুড়া > বাঁকড়ে, পরিষদ > পরষদ। লবঙ্গ > লং (বাঁকুড়া)। ইতি-হ-আস > ইতিহাস।

(১৫) ধ্বনি-প্রসারণ (ধ্বনি-বিস্ফোরণ) (Expansion) :

দীর্ঘ বা ধীর উচ্চারণে কোনো কোনো সময় আমরা শব্দের নির্দিষ্ট সংখ্যক ধ্বনিকে বাড়িয়ে উচ্চারণ করি, তাকে প্রসারণ বলে। যেমন - পতুগীজ পেরা > বাংলা পেয়ারা; স্মন > সিনান ।।

চার ।। ধ্বনি-স্থানান্তর

শব্দের মধ্যে একটি ধ্বনি অন্য ধ্বনির স্থানে গেলে, বা ধ্বনিগুলি পরস্পর স্থান বদল করলে, ‘ধ্বনি-স্থানান্তর’ হয়। প্রধানত বিপর্যাসের (= বিপর্যয়) মাধ্যমেই স্থানান্তর ঘটে।

বিপর্যাস (Metathesis) : একটি শব্দের মধ্যে যদি দুটি ধ্বনি পরস্পর স্থান বিনিময় করে তাহলে বিপর্যাস ঘটে। যেমন -
মুকুট > মুটুক; রিক্সা > রিস্কা; হৃদ > দহ > হদ। জানালা > জালানা, বাস্ক > বাস্ক, জীবাণু > বীজাণু।
এছাড়া ‘জোড়কলম শব্দনির্মাণ’, ‘মিশ্রণ’ প্রভৃতি আরো বহুবিধ কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। যেমন - জোড়কলম
শব্দ নির্মাণে - হাঁস + জারু > ‘হাঁসজারু’। নিশ্চল + চুপ > নিশ্চুপ ।।



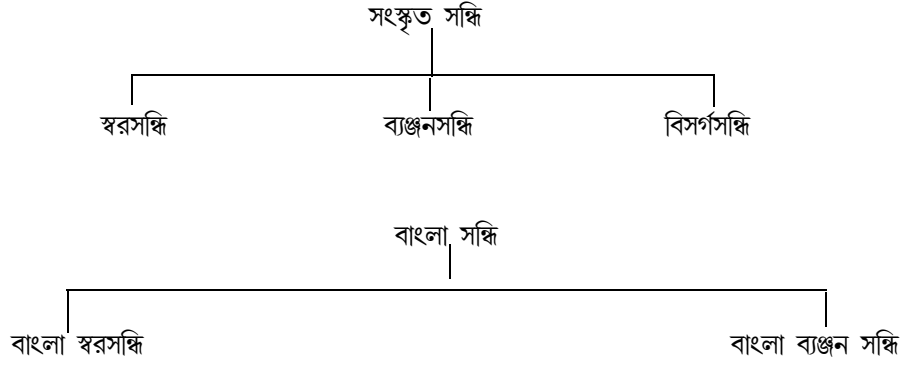
teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 6

১.৬.১ সন্ধি :

সন্ধি : পরস্পর সন্নিহিত দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।

সন্ধির প্রকারভেদ :



স্বরসন্ধি : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের যে মিলন হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে।

(১) ‘অ’-কার কিংবা ‘আ’-কারের পর ‘অ’-কার কিংবা ‘আ’-কার থাকলে উভয় মিলে ‘আ’-কার হয়; সেই ‘আ’-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

সূত্র	উদাহরণ
অ + আ = আ	স্বায়ত্ত = স্ব + আয়ত্ত ; সিংহাসন = সিংহ + আসন
আ + আ = আ	সুধাধার = সুধা + আধার ; কল্পনালোক = কল্পনা + আলোক
আ + অ = আ	পূজার্চনা = পূজা + আর্চনা ; যথার্থ = যথা + অর্থ
অ + অ = আ	বেদান্ত = বেদ + অন্ত ; অপরাহু = অপর + অহু

(২) ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয়; সেই ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

সূত্র	উদাহরণ
ই + ই = ঈ	রবীন্দ্র = রবি + ইন্দ্র ; অভীষ্ট = অভি + ইষ্ট
ই + ঈ = ঈ	গিরীশ = গিরি + ঈশ ; পরীক্ষা = পরি + ঈক্ষা
ঈ + ই = ঈ	সুধীন্দ্র = সুধী + ইন্দ্র ; সতীন্দ্র = সতী + ইন্দ্র
ঈ + ঈ = ঈ	পৃথীশ = পৃথী + ঈশ ; শচীশ = শচী + ঈশ

৩) ‘উ’-কার বা ‘ঊ’-কারের পর ‘উ’-কার বা ‘ঊ’-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘ঊ’-কার হয়; সেই ‘ঊ’-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

সূত্র	উদাহরণ
উ + উ = ঊ	কটুক্তি = কটু + উক্তি ; মরাদ্যান = মরু + উদ্যান
ঊ + ঊ = ঊ	লঘুর্মি = লঘু + উর্মি ; অনুর্ধ্ব = অনু + উর্ধ্ব
উ + ঊ = ঊ	বধূদয় = বধু + উদয় ; বধুৎসব = বধু + উৎসব
ঊ + ঊ = ঊ	সরযূর্মি = সরযু + উর্মি ; ভূর্ধ্ব = ভূ + উর্ধ্ব

৪) ‘অ’-কার কিংবা ‘আ’-কারের পর ‘ই’-কার কিংবা ‘ঈ’-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘এ’-কার হয়; সেই ‘এ’-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

সূত্র	উদাহরণ
অ + ই = এ	স্বৈচ্ছা = স্ব + ইচ্ছা ; পূর্ণেন্দ্র = পূর্ণ + ইন্দ্র
অ + ঈ = এ	রাজ্যেশ্বর = রাজ্য + ঈশ্বর ; ভবেশ = ভব + ঈশ
আ + ই = এ	যথেষ্ট = যথা + ইষ্ট ; সুধেন্দ্র = সুধা + ইন্দ্র
আ + ঈ = এ	সহেশান = সহা + ঈশান ; সারদেশ্বরী = সারদা + ঈশান

৫) ‘অ’-কার কিংবা ‘আ’-কারের পর ‘উ’-কার বা ‘ঊ’-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘ও’-কার হয় ; সেই ‘ও’-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

সূত্র	উদাহরণ
অ + উ = ও	দামোদর = দাম + উদর ; রাসোৎসব = রাস + উৎসব
অ + ঊ = ও	চঞ্চলোর্মি = চঞ্চল + উর্মি ; পর্বতোর্ধ্ব = পর্বত + উর্ধ্ব
আ + উ = ও	মহোপকার = মহা + উপকার ; বিদ্যোপার্জন = বিদ্যা + উপার্জন
অ + ঊ = ও	নবোঢ়া = নবা + উঢ়া ; মহোর্মি = মহা + উর্মি

৬) ‘অ’-কার কিংবা ‘আ’-কারের পর ‘ঋ’-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘অর্’ এর ‘অ’ পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং ‘র্’ রেফ (’) হয়ে পরবর্ণের ক্ষেত্রে ‘রেফ’ মাথায় বসে।

সূত্র	উদাহরণ
অ + ঋ = অর্	দেবর্ষি = দেব + ঋষি ; বিপ্রর্ষি = বিপ্র + ঋষি
আ + ঋ = অর্	মহর্ষি = মহা + ঋষি ; মহর্ষভ = মহা + ঋষভ
অ + ঋত = আর্ত	শীতার্ত = শীত + ঋত ; দুঃখার্ত = দুঃখ + ঋত
আ + ঋত = আর্ত	বেদনার্ত = বেদনা + ঋত ; পিপাসার্ত = পিপাসা + ঋত

৭) ‘অ’-কার কিংবা ‘আ’-কারের পর ‘এ’-কার কিংবা ‘ঐ’ থাকলে উভয়ে মিলে ‘ঐ’-কার হয় ; সেই ‘ঐ’-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

সূত্র	উদাহরণ
অ + এ = ঐ	জনৈক = জন + এক ; হিতৈষণা = হিত + এষণা
অ + ঐ = ঐ	মতৈক্য = মত + ঐক্য ; বিভৈশ্বর্য = বিভ + ঐশ্বর্য
আ + এ = ঐ	সদৈব = সদা + এব ; তথৈব = তথা + এব
আ + ঐ = ঐ	মহৈশ্বর্য = মহা + ঐশ্বর্য ; মহৈরাবত = মহা + ঐরাবত

৮) ‘অ’-কার কিংবা ‘আ’-কারের পর ‘ও’-কার কিংবা ‘ঔ’-কার থাকলে উভয়ে মিলে ‘ঔ’-কার হয় ; সেই ‘ঔ’-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

সূত্র	উদাহরণ
অ + ও = ঔ	বনৌষধি = বন + ওষধি ; মাংসৌদন = মাংস + ওদন
অ + ঔ = ঔ	অমৃতৌষধ = অমৃত + ঔষধ ; চিত্রৌদাস্য = চিত্র + ঔদাস্য
আ + ও = ঔ	গঙ্গৌষ = গঙ্গা + ওষ ; মহৌষধি = মহা + ওষধি
আ + ঔ = ঔ	মহৌদার্য = মহা + ঔদার্য ; মহৌৎসুক = মহা + ঔৎসুক

৯) ‘ই’-কার কিংবা ‘ঈ’-কারের পর ‘ই’-কার কিংবা ‘ঈ’-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে পূর্ববর্তী ‘ই’-কার কিংবা ‘ঈ’-কার স্থানে ‘য’ হয় ; সেই ‘য’ য ফলা (i) হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ‘য’ তে যুক্ত হয়।

আদি + অনড = আদ্যান্ড ; প্রতি + আগমন = প্রত্যাগমন
ইতি + আদি = ইত্যাদি ; অধি + উষিত = অধুষিত
প্রতি + অপিত = প্রত্যাচিত ; প্রতি + উষ = প্রতুষ
অভি + আগত = অভ্যাগত ; যদি + অপি = যদ্যপি

১০) ‘উ’-কার কিংবা ‘ঊ’-কারের পর ‘উ’-কার কিংবা ‘ঊ’-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে পূর্ববর্তী ‘উ’-কার কিংবা ‘ঊ’-কার স্থানে ‘ব’ হয় ; সেই ব্ ফলা হিয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব-ফলার যুক্ত হয়।

অনু + অয় = অনুয় ; সু + অল্প = স্বল্প ; সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ
মনু + অন্তর = মনুন্তর ; সু + আগত = স্বাগত ; সু + অস্থি = স্বস্থি

১১) ‘ঋ’-কারের পর ‘ঋ’ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকলে ‘ঋ’-স্থানে ‘র্’ হয়। এই ‘র্’ ‘র’ ফলা (r) হইয়া পূর্ববর্ণের পদতলে বসে ; পরবর্তী স্বর র্-ফলায় যুক্ত হয়।

পিতৃ + অনুমতি = পিত্রনুমতি ; মাতৃ + আদেশ = মাত্রাদেশ
--

১২) অন্যস্বর পরে থাকলে পূর্ববর্তী ‘এ’-কার স্থানে ‘অয়্’ , ‘ঐ’-কার স্থানে ‘আয়্’ ‘ও’-কার স্থানে ‘অব্’ ‘ঔ’-কার স্থানে ‘আব্’ হয়। পরবর্তী স্বরবর্ণটি ‘য়্’ কিংবা ‘ব্’ এর সহিত যুক্ত হয়।

নে + অন = নয়ন ; শে + আন = শয়ান ; গৈ + অক = গায়ক
নৈ + ইকা = নায়িকা ; ভো + অন = ভবন ; পো + ইত্র = পবিত্র

• **নিপাতন সন্ধি :**

যে সমস্ত শব্দ সন্ধিসূত্রের মধ্যে পড়ে না অথচ সন্ধিবদ্ধ হয় কিংবা যে সমস্ত শব্দ সন্ধির নিয়ম মতো সুনির্দিষ্ট রূপ না পেয়ে অন্যপ্রকার রূপ লাভ করে, নিয়ম বহির্ভূত সেই সন্ধিকে নিপাতন সন্ধি বলা হয়। নিপাতন সিদ্ধ স্বরসন্ধিগুলি হল ট

কুল + অটা = কুলটা ; সম + অর্থ = সমর্থ ; গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র

প্র + উট = প্রৌট ; গো + অক্ষ ; সার + অঙ্গ = সারঙ্গ

• **ব্যঞ্জন সন্ধি :**

ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের কিংবা স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বর্ণের মিলন কে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে।

১) স্বরবর্ণ, বর্ণের তৃতীয় বা চতুর্থবর্ণ কিংবা য় র ল্ ব্ হ্ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ক্ স্থানে গ্ চ্ স্থানে জ্ ট্ স্থানে ড্ এবং প্ স্থানে ব্ হয়।

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত ; দিক্ + ভ্রম = দিগভ্রম ; দিক্ + বিজয়ী = দিগবিজয়ী

বাক্ + ঈশ্বরী = বাগীশ্বরী ; দিক্ + গজ = দিগগজ

প্রক্ + উক্ত = প্রাক্তুক্ত ; বাক্ + দেবী = বাগদেবী

২) স্বরবর্ণ গ্ ঘ্ দ্ ধ্ ব্ ভ্ কিংবা য় র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে দ্ হয়।

জগৎ + ঈশ্বর = জগদীশ্বর ; উদ্ + যোগ = উদযোগ ;

উদ্ + যত = উদ্যত ; উদ্ + দীপ্ত = উদীপ্ত

ভগবৎ + গীতা = ভগবদগীতা ; বৃহৎ + রথ = বৃহদ্রথ

৩) ‘চ্’ কিংবা ‘ছ্’ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘ত্’ বা ‘দ্’ স্থানে চ্ হয়।

সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র ; সৎ + চিদানন্দ = সচ্চিদানন্দ

উদ্ + ছেদ = উচ্ছেদ ; উদ্ + চকিত = উচ্চকিত

৪) ‘জ্’ কিংবা ‘ঝ্’ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘ত্’ বা ‘দ্’ স্থানে ‘জ্’ হয়।

যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন ; উদ্ + জ্বল = উজ্জ্বল

উদ্ + জীবিত = উজ্জীবিত ; বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক

৫) ‘ট্’ কিংবা ‘ঠ্’ থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘ত্’ বা ‘দ্’ স্থানে ‘ট্’ হয়।

তদ্ + টীকা = তট্টীকা

৬) ‘ড্’ কিংবা ‘ঢ্’ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘ত্’ বা ‘দ্’ স্থানে ‘ড্’ হয়।

উদ্ + ডীন = উড্ডীন

৭) ‘ল্’ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘ত্’ বা ‘দ্’ স্থানে ‘ল্’ হয়।

উদ্ + লাস = উল্লাস ; তদ্ + লিপি = তল্লিপি

৮) ক্ খ্ ত্ থ্ প্ ফ্ স্ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত দ্ বা ধ্ স্থানে ত্ (ৎ) হয়।

বিপদ্ + পাত = বিপৎপাত ; তদ্ + সম = তৎসম

৯) ‘শ্’ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ত্ বা দ্ স্থানে চ্ এবং শ্ স্থানে ছ্ হয়।

উদ্ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস ; উদ্ + শ্বাসিয়া = উচ্ছ্বাসিয়া

১০) হ্ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘ত্’ বা ‘দ্’ স্থানে ‘দ্’ স্থানে ‘দ্’ এবং ‘হ্’ স্থানে ‘ধ্’ হয়।

উদ্ + হত = উদ্ধত ; উদ্ + হার = উদ্ধার ; পদ্ + হাতি = পদ্ধতি

১১) পূর্বপদের অন্তস্থিত 'হ', 'ধ' কিংবা 'ভ' এর পরে 'ত' থাকলে হত হবে 'ধ্ব' ধত হইবে 'দ্ধ' ভত হইবে দ্ধ।

বিমূহ + ত = বিমূদ্ধ ; বুধ + ত = বুদ্ধ ; দুহ + ত = দুদ্ধ

১২) পূর্বপদের অন্তস্থিত স্বরবর্ণের পরে 'ছ' থাকলে 'ছ' স্থানে 'চ্ছ' হয়।

স্ব + ছন্দ = স্বচ্ছন্দ ; পূর্ণ + ছেদ = পূর্ণচ্ছেদ ; সুবর্ণ + ছবি = সুবর্ণচ্ছবি

১৩) পূর্বপদের অন্তস্থিত 'চ' বা 'জ' এর পর 'ন' থাকলে 'ন' স্থানে 'ঞ' হয়।

যাচ্ + না = যাচঞা ; রাজ + নী = রাঞী

১৪) 'ন' কিংবা 'ম' পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ক' স্থানে 'ঙ' 'ট' স্থানে 'ণ' , 'ত' বা দ স্থানে ন্ এবং 'প' স্থানে 'ম' হয়।

দিक् + নিরূপণ = দিঙনিরূপণ ; জগৎ + নাথ = জগন্নাথ

তদ্ + ময় = তন্ময় ; উদ্ + নয়ন = উন্ময়ন

১৫) 'শ্' 'স্' 'হ' পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ন' স্থানে অনুস্বর হয়।

দন্ + শন = দংশন ; হিন্ + সা = হিৎসা ; জিহ্বান্ + সা = জিহ্বাৎসা

১৬) 'চ' থেকে 'ম' পর্যন্ত যেকোনো বর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে পরবর্তী বর্ণীয় বর্ণটির পঞ্চম বর্ণ হয়।

সম্ + চয় = সঞ্চয় ; সম্ + কীর্তন = সংকীর্তন

সম্ + গোপন = সঙ্গোপন ; সম্ + গীত = সঙ্গীত

১৭) ক খ গ ঘ যে কোনো একটি বর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে 'ঙ' কিংবা অনুস্বর (ৎ) হয়।

সম্ + কীন = সঙ্কীন ; সম্ + কীর্তন = সংকীর্তন

সম্ + গোপন = সঙ্গোপন ; সম্ + গীত = সঙ্গীত

১৮) য় র্ ল্ ব্ শ্ য়্ স্ হ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে অনুস্বর হয়।

সম্ + যত = সংযত ; সম্ + রক্ষন = সংরক্ষন

সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন ; সম্ + বাদ = সংবাদ

১৯) 'ষ' এর পর 'ত' কিংবা 'থ' থাকলে 'ত' স্থানে 'ট' এবং 'থ' স্থানে 'ঠ' হয়।

বৃষ + তি = বৃষ্টি ; ইষ + তক = ইষ্টক ; ষষ + থ = ষষ্ঠ

২০) উদ্ উপসর্গের পরে স্থা ও স্তন্য ধাতুর স্ লোপ পায়।

উদ্ + স্থাপন = উত্থাপন

২১) সম্ ও পরি উপসর্গের পরে 'ক্' ধাতু (অর্থাৎ ওই ধাতুনিম্ন কার করণ , কারক, কারিকা কৃত, কৃতি ক্রিয়া ইত্যাদি থাকলে ধাতুর পূর্বে স্ র আগম হয় এবং ম্ অনুস্বর হইয়া যায়।

হিন্স + অ = সিংহ ; পুমস্ + লিঙ্গ = পুংলিঙ্গ

• বিসর্গসন্ধি :

বিসর্গের সহিত স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের যে সন্ধি তাকে বিসর্গসন্ধি বলে।

• শ্রেণীবিভাগ :



• স্-জাত বিসর্গ : পদের শেষে স্-এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাই স্-জাত বিসর্গ :

মনস্ = মনঃ ; সরস্ = সরঃ ; বয়স্ = বয়ঃ ; শিরস্ = শিরঃ

• র্-জাত বিসর্গ : পদের শেষে 'র্' এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে র্-জাত বিসর্গ বলে।

অন্তর্ = অন্তঃ ; নির্ = নিঃ ; পুনর্ = পুনঃ

১) 'চ' বা 'ছ' পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে শ্ হয়।

নিঃ + চল = নিশ্চল ; নভঃ + চর = নভশ্চর ; নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন

২) 'ট' বা 'ঠ' পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে 'ষ' হয়।

ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার ; চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়

৩) 'ত' বা 'থ' পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে 'স্' হয়।

ইতঃ + তত = ইতস্ততঃ ; মনঃ + তাপ = মনস্তাপ

৪) পূর্বপদের শেষে যদি অ-কার ও বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথমবর্ণ ও যদি অ-কার হয় তবে সেই অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়ে ও-কার হয় ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী অ-কার লোপ পায়।

ততঃ + অধিক = ততোধিক ; বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক ; মনঃ + অভিলাষ = মনোভিলাষ ; যশঃ + অভীপ্সা = যশোভীপ্সা

৫) পূর্বপদের শেষে যদি অ-কার ও স্-জাত বিসর্গ থাকে এবং বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ অথবা য় ল্ ব্ হ্ এদের যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয় তাহা হলে অ-কার ও বিসর্গ উভয়ে মিলিয়ে ও-কার হয় ; ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

মনঃ + দীন = মনোদীন ; তপঃ + বন = তপোবন ; তিরঃ + ধান , সদ্য + জাত = সদ্যোজাত

৬) পূর্বপদের শেষস্থ অ-কারের পর যদি র্-জাত বিসর্গ থাকে এবং স্বরবর্ণ বর্ণের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ ; কিংবা য় ল্ ব্ হ্ এদের যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয়, তাহা হইলে র্-জাত বিসর্গের স্থানে র্ হয় ; সেই নবজাত র্ পরবর্তী স্বরবর্ণের সাথে যুক্ত হয় কিংবা রেফ (') হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মস্তকে চলে যায়।

অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা ; অন্তঃ + লোক = অন্তর্লোক

৭) পূর্বপদের শেষে অ-কার ও আ-কার ভিন্ন স্বরের পরে যদি বিসর্গ থাকে, এবং স্বরবর্ণে বর্ণের তৃতীয় , চতুর্থ পঞ্চমবর্ণ বা য় ল্ ব্ হ্ যেকোনো একটি যদি পরপদের প্রথমবর্ণ হয় , তবে বিসর্গের স্থানে 'র্' হয় ; সেই নবজাত র্ পরবর্তী স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয় কিংবা রেফ হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মস্তকে চলে যায়।

নিঃ + অক্ষুর = নিরক্ষুর ; নিঃ + আনন্দ = নিরানন্দ

৮) পরপদের প্রথমবর্ণ যদি 'র্' হয় তাহলে পূর্বপদের শেষে 'র্' জাত বিসর্গের লোপ হয় এবং বিসর্গের পূর্বস্থ স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হয় অর্থাৎ 'অ' স্থানে 'আ' ; 'ই' স্থানে 'ঈ' ; 'উ' স্থানে 'ঊ' হয়।

৯) অ-কার বা আ-কারের পর বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথমবর্ণ ক্ খ্ প্ ফ্ যেকোনো একটি হইলে সেই বিসর্গ স্থানে 'স' হয়।

নমঃ + কার = নমস্কার ; বাচ + পতি = বাচস্পতি

১০) ক্ খ প্ ফ্ যেকোনো একটি বর্ণ পরপদের প্রথম বর্ণ হইলে নিঃ, আবিঃ, বহিঃ, দুঃ, চতুঃ, প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ স্থানে ‘ষ’ হয়।

নিঃ + প্রয়োজন = নিষ্প্রয়োজন ; নিঃ + প্রভ = নিষ্প্রভ

১১) প্রথমপদের অন্তে ‘অ’-কারের পর যদি বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথমবর্ণ যদি অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ হয় তখন বিসর্গের লোপ হয় লোপের পর আর সন্ধি হয় না।

অতঃ + এব = অতএব ; শিরঃ + উপরি = শিরউপরি

১২) পরপদের প্রথমে স্ত, স্থ, স্প থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত বিসর্গ বিকল্পে লুপ্ত হয়।

নিঃ + স্পন্দ = নিস্পন্দ ; মনঃ + স্থ = মনস্থ

• নিপাতন সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি :

গীর + পতি = গীর্ষতি ; অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র

• বাংলা স্বরসন্ধি :

১) পাশাপাশি দুইটি স্বরবর্ণ থাকলে একটি লোপ হয়।

বা + এক = বারেক ; গুটি + এক = গুটিক

অর্ধ + এক = অর্ধেক ; দাদা + এর = দাদার

২) অ, আ, ই, উ, এ, ও প্রভৃতি পরের পর এ-কার থাকলে সেই এ-কার বিকৃত হয়ে য় (য়ে) হয়।

ভাল + এ = ভালয় ; আলো + এ = আলোয়

৩) সংস্কৃত সন্ধির আনুকরণে বাংলা স্বরসন্ধি (তৎসম শব্দের সহিত অতৎসম শব্দের মিলন)

বাপ + অন্ত = বাপান্ত ; মত + অন্তর = মতান্তর

• বাংলা ব্যঞ্জন সন্ধি :

১) পরপদের প্রথমবর্ণ ব্যঞ্জন হলে পূর্বপদের শেষ স্বর লোপ পায়।

‘অ’ লোপ : বড় + দাদা = বড়দাদা

‘আ’ লোপ : কাঁচা + কলা = কাঁচকলা

‘ই’ লোপ : মিশি + কালো = মিশ্কালো

‘উ’ লোপ : উচু + কপালী = উচুকপালী

‘এ’ লোপ : পিছে + মোড়া = পিছমোড়া

২) পরপদের প্রথমবর্ণ ঘোষবর্ণ হলে পূর্বপদের শেষ অঘোষ ব্যঞ্জনটির স্থানে ঘোষ হয়।

জগৎ + জন = জগজন ; জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধ

৩) পরপদের প্রথমবর্ণ ঘোষবর্ণ হলে পূর্বপদের শেষ অঘোষ ব্যঞ্জনটির স্থানে ঘোষ হয়।

ডাক + ঘর = ডাগঘর ; এক + গুণ = এগুণ

৪) পরপদের প্রথমবর্ণ অঘোষ হইলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘চ’ স্থানে ‘শ’ হয়।

রাগ + করেছে = রাক্‌করেছে ; বড় + ঠাকুর = বট্‌ঠাকুর

৫) ‘শ’ ‘ষ’ ‘স’ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘চ’ স্থানে শ্ হয়।

পাঁচ + শ = পাঁশশ ; পাঁচ + যোলং = পাঁশযোলং

৬) পরপদের প্রথমে ‘চ’ বর্ণের বর্ণ থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ‘ত’ বর্ণের বর্ণটি চ-বর্ণের বর্ণের সহিত মিলিয়া যায়।

সাত + জন্ম = সাজ্‌জন্ম ; হাত + ছানি = হাচ্‌ছানি

৭) স্বর্ণের পর 'ছ' থাকলে 'ছ' স্থানে সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির অনুরূপ 'চ্ছ' হয়।

বি + ছিরি = বিচ্ছিরি

৮) পরপদের প্রথমবর্ণ ব্যঞ্জন হইলে পূর্বপদের শেষবর্ণ 'র' সেই ব্যঞ্জনে পরিনত হয়।

চার + টি = চাট্টি ; কর + না = কন্না

১.৬.২ সমাস :

‘সমাস’ শব্দটির অর্থ হল ‘সংক্ষেপ’। সংক্ষেপে সুন্দর করে বলার উদ্দেশ্যে পরস্পর অর্থ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক বৈশী পদকে একপদে পরিণত করার নাম সমাস।

উদা: বীণা পানিতে যার = বীণাপানি।

- **সমস্ত পদ :** সমাসে একাধিক পদ মিলিত হয়ে যে নতুন পদ গঠন করে, তাকে সমস্ত পদ বা সমাস বদ্ধ পদ বলে।
উদা: বীণাপানি।
- **সমস্যমান পদ :** যে সব পদের সমন্বয়ে সমস্ত পদের সৃষ্টি, তাদের প্রত্যেকটিকে সমস্যমান পদ বলে।
যেমন - বীণা পানিতে যার = বীণাপানি
এখানে বীণা, পানিতে, যার তিনটি সমস্যমান পদ।
- **ব্যাসবাক্য :** ব্যাস শব্দের অর্থ বিস্তার। সমস্ত পদের বিশ্লেষণ করে সমাসের অর্থটি যে বাক্য বা ব্যাকাংশের দ্বারা ব্যাখ্যা করে দেখানো হয় তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বা সমাসবাক্য বলে।
- **সমাসের শ্রেণিবিভাগ :**
সংস্কৃতে সমাস প্রদানত চার প্রকার - দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীতি ও অব্যয়ীভাব।
- বাংলা সমাসকে মোটামুটি ৬ ভাগে ভাগ করা হয় -
ক) দ্বন্দ্ব খ) তৎপুরুষ গ) কর্মধারায় ঘ) দ্বিগু ঙ) বহুব্রীতি চ) অব্যয়ীভাব

ক) **সংযোগমূলক সমাস** - দ্বন্দ্ব ও সমর্থক দ্বন্দ্ব

খ) **ব্যাক্যমূলক সমাস** - ১. তৎপুরুষ সমাস, ২. কর্মধারায় সমাস, ৩. দ্বিগু সমাস

গ) **বর্নামূলক সমাস** - বহুব্রীতি সমাস।

■ দ্বন্দ্ব সমাস :

যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায় তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। দ্বন্দ্ব সমাসের ব্যাসবাক্য সমস্যমান পদগুলি ও, এবং, আর প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে।

১) বিশেষ্য পদে দ্বন্দ্ব:

ক) দুটি সাধারণ বিশেষ্যপদে-

কৃষ্ণ ও অর্জুন = কৃষ্ণার্জুন

শাখা ও সিদুর = শাখাসিদুর

শীত ও বসন্ত = শীতবসন্ত

খ) দুটি বিপরীতার্থক বিশেষ্য পদে-

দেব ও দানব = দেবদানব

আকাশ ও পাতাল = আকাশ পাতাল

গুরু ও শিষ্য = গুরুশিষ্য

গ) দুটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদে-

আসা ও যাওয়া = আসাযাওয়া

হাসি ও কান্না = হাসিকান্না

দেনা ও পাওনা = দেনাপাওনা

ঘ) দুটি সমার্থক বা প্রায় সমার্থক বা সহচর পদে-

হাট ও বাজার = হাটবাজার

আত্মীয় ও স্বজন = আত্মীয়স্বজন

ঙ) একটি সার্থক ও একটি নিরর্থক পদে-
বাসন ও কোসন = বাসনকোসন
চাকর ও বাকর = চাকরবাকর

চ) দুইয়ের বেশি বিশেষ্য পদে-
শঙ্ক, চক্র, গদা ও পদ্ম = শঙ্খচক্রগদাপদ্ম
আদি, মধ্য ও অন্ত = আদিমধ্যান্ত

ছ) বিশেষ নিয়মে সিদ্ধ দুটি বিশেষ্য দ্বন্দ্ব-
অহঃ ও রাত্রি = অহোরাত্র [রাত্রি....রাত্রা]
দ্যৌঃ ও ভূমি = দ্যাবাভূমি

২. বিশেষণ পদে দ্বন্দ্ব-

ক) বিপরীতার্থক দুটি বিশেষণে -
ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ
ইতর ও ভদ্র = ইতরভদ্র

খ) দুটি সমার্থক বিশেষণে -
সহজ ও সরল = সহজসরল
দীন ও দরিদ্র = দীনদরিদ্র

গ) দুটি ক্রিয়াবাচক বিশেষণে -
যাত ও আয়াত = যাতায়াত
হিত ও অহিত = হিতাহিত

ঘ) একাধিক বিশেষণ পদে-
সত্য, শিব ও সুন্দর = সত্য শিবসুন্দর

৩. দুটি সর্বনাম পদে দ্বন্দ্ব সমাস-

যার ও তার = যার-তার

৪. দুটি অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব-

হেসে ও খেলে = হেসে-খেলে

৫. দুটি সমাপিকা ক্রিয়ার দ্বন্দ্ব-

দেখ ও শোন = দেখ-শোন

৬. অলুক দ্বন্দ্ব - যখন সমাসের সমস্ত পদ গঠনের সময় সমস্যমান পদগুলির বিভক্তির লোপ হয় না তখন তাকে বলে অলুক বা আলোক সমাস।

মায়ে ও বিয়ে = মায়েবিয়ে

হাটে ও বাটে = হাটেবাটে

■ তৎপুরুষ সমাস:

যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রদান হয় এবং পূর্বপদকে দ্বারা, জন্য, হতে, র, এ প্রভৃতি কারকবোধক ও অকারকবোধক বিভক্তিগুলি যুক্ত থাকে তাকে বলে তৎপুরুষ সমাস।

তৎপুরুষের শ্রেণিভেদ:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ১. কর্ম তৎপুরুষ | ২. করণ তৎপুরুষ |
| ৩. নিমিত্ত তৎপুরুষ | ৪. অপাদান তৎপুরুষ |
| ৫. সম্বন্ধ তৎপুরুষ | ৬. অধিকরণ তৎপুরুষ |
| ৭. ব্যাপ্তি তৎপুরুষ | ৮. ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ |
| ৯. নঞ তৎপুরুষ/ না তৎপুরুষ | ১০. প্রাদি তৎপুরুষ/ উপসর্গ তৎপুরুষ |
| ১১. কু তৎপুরুষ | ১২. উপপদ তৎপুরুষ |
| ১৩. অলুক তৎপুরুষ | |

১) **কর্ম তৎপুরুষ** : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্ব পদটিকে কে, রে প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত থাকে তাকে বলে কর্ম তৎপুরুষ।

কষ্টকে প্রাপ্ত = কষ্টপ্রাপ্ত

বধুকে বরণ = বধুবরণ

২) **করণতৎপুরুষ সমাস** : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদটিকে দ্বারা যুক্ত তাকে বলে করণ তৎপুরুষ সমাস।

যত্নের দ্বারা সাদ্য = যত্নসাদ্য

অস্ত্রের দ্বারা আহত = অস্ত্রাহত

৩) **নিমিত্ততৎপুরুষ সমাস** : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদটিকে জন্য, নিমিত্ত প্রভৃতি বিভক্তি (অনুসর্গ) যুক্ত থাকে তাকে বলে নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস।

রান্নার নিমিত্ত ঘর = রান্নাঘর

জলের জন্য কর = জলকর

৪) **অপাদান তৎপুরুষ সমাস** : যে তৎপুরুষ সমাসের পূর্বপদটিকে হতে, হইতে, থেকে ইত্যাদি বিভক্তির চিহ্ন (অনুসর্গ) যুক্ত থাকে তাকে বলে অপাদান তৎপুরুষ সমাস।

বৃন্ত থেকে চ্যুত = বৃন্তচ্যুত

মনুষ্য হইতে ইতর = মনুষ্যেতর

৫) **সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস** : সম্বন্ধ পদ এর বিভক্তি গুলি হল, র, এর, দেব, এদের। এই বিভক্তিগুলি পূর্বপদে যুক্ত থেকে যে তৎপুরুষ সমাস গঠন করে তাকে বলে সম্বন্ধ তৎপুরুষ।

গণের ইশ = গণেশ

গৌরীর ইশ = গৌরিশ

৬) **অধিকাংশ তৎপুরুষ সমাস** : যে তৎপুরুষের পূর্বপদটিকে এ, এতে, তে, য় বিভক্তি যুক্ত থাকে তাকে বলে অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস।

অগ্রগন্য = অগ্রগন্য

গঙ্গায় স্নান = গঙ্গাস্নান

৭) **ব্যাপ্তি তৎপুরুষ** : ব্যাপ্তি অর্থে পূর্বপদে কালবাচক বা স্থানবাচক শব্দের সঙ্গে যে তৎপুরুষ সমাস গঠিত হয় তাকে বলে ব্যাপ্তি তৎপুরুষ।

চির (কাল) ব্যোপেষ্ময়ী = চিরস্থায়ী

বিশ্ব ব্যোপে যুদ্ধ = বিশ্বযুদ্ধ

৮) **ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ** : ক্রিয়াবিশেষণ পদের সঙ্গে পরবর্তী কৃদন্ত পদের তৎপুরুষ সমাসকে বলে ক্রিয়াবিশেষণ তৎপুরুষ।

আধরূপে পাকা = আধপাকা

অর্ধরূপে উচ্চারিত = অর্ধোচ্চারিত

৯) **নঞ তৎপুরুষ না তৎপুরুষ** : নঞর্থক অব্যয় পূর্বপদে বসে যে তৎপুরুষ গঠন করে তাকে নঞ তৎপুরুষ না তৎপুরুষ সমাস বলে।

নয় অন্বিত = অনন্বিত

নয়রসিক = অরসিক

১০) প্রাদিতৎপুরুষ/ উপসর্গ তৎপুরুষ :

‘প্রাদি’ হল ‘প্র’ আদিতে যার। অর্থাৎ ‘প্র’ দিয়ে যাদের সূচনা হয়েছে তারাই প্রাদি। সংস্কৃতে ‘প্রাদি’ বলতে প্র, পরা, অপ্,

সব, ইত্যাদি কড়িটি উপসর্গ বোঝায়।

প্র (প্রকৃষ্ট) ভাব = প্রভাব

পরা (অতিশয়) ক্রম (বল) = পরাক্রম

১১) কু তৎপুরুষ : সংস্কৃত ভাষায় ‘কু’ বলতে একটি অব্যয় আছে, বাংলাতেও আছে। ‘কু’ এই অব্যয়টিকে পূর্বপদে বসিয়ে যে তৎপুরুষ সমাস গঠন করা হয় তাকে বলে কু তৎপুরুষ সমাস।

কু (কুৎসিত) মাতা = কুমাতা

কু (কপট) চক্র = কুচক্র

১২) উপপদ তৎপুরুষ সমাস : উপপদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাকে বলে উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

জল দেয় যে = জলদ

কঠে থাকে যা = কঠস্থ

বেদ জানেন যিনি = বেদজ্ঞ

১৩) অলুক তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসের সমস্ত পদ গঠনের সময় পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে।

হাতে (হাতের দ্বারা) কাটা = হাতে - কাটা

পরটস্ম (পরের নিমিত্ত) পদ = পরস্মৈপদ

■ কর্মধারায় সমাস :

বিশেষ্য - বিশেষ্যে, বিশেষণে - বিশেষণে, বিশেষণে - বিশেষ্য, এবং বিশেষ্যে - বিশেষণে যে সমাস গঠিত হয় তাকে বলে কর্মধারায় সমাস।

উদাহরণ - নীল যে অশ্বর = নীলাশ্বর

ক) বিশেষণে - বিশেষ্যে কর্মধারায়

নীল যে আকাশ = নীলাকাশ

ছিন্ন যে বস্ত্র = ছিন্নবস্ত্র

খ) বিশেষ্যে - বিশেষ্যে

যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি

যা খোঁজ তাই খবর = খোঁজখবর

গ) বিশেষণে - বিশেষণে

কাঁচা অথচ মিঠে = কাঁচামিঠে

মিটে অথচ কড়া = মিঠে কড়া

ঘ) বিশেষ্যে - বিশেষণে

সাধারণ যে জন = জনসাধারণ

বিশিষ্ট যে নাটক = নাটক বিশেষ

কর্মধারায় সমাসের শ্রেণিবিভাগ:

কর্মধারায় সমাস প্রধানত তিন প্রকার-

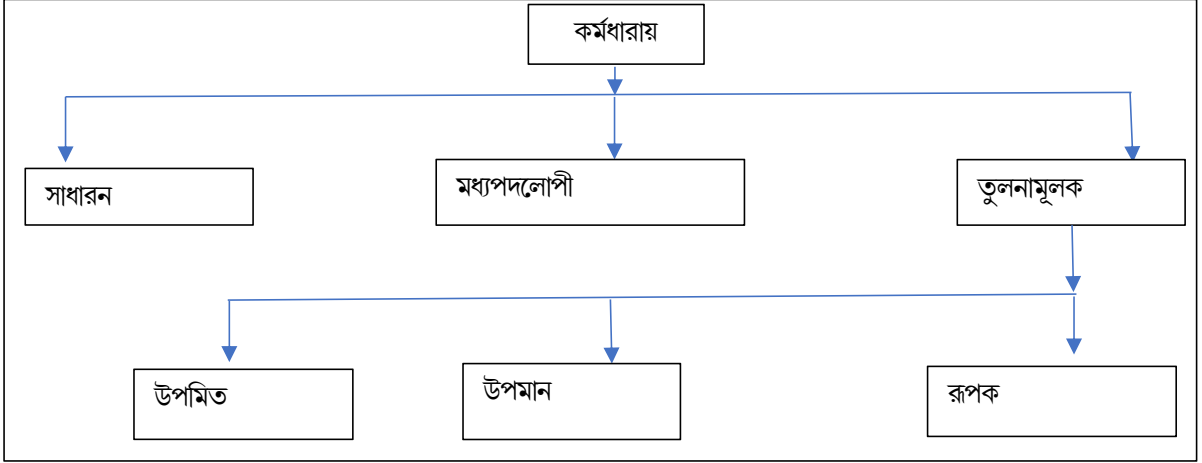
ক) সাধারণ কর্মধারায় সমাস

খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সমাস

গ) তুলনামূলক কর্মধারায় সমাস

তুলনামূলক কর্মধারায় সমাস আবার তিন প্রকার-

উপমিত, উপমান ও রূপক



বিশেষ্য-বিশেষন সম্প্রকৃত যে সকলের কথা আগে আলোচিত হল সেগুলিই সাধারণ কর্মধারায়ের অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যপদলোপী কর্মধারায় সমাস : যে কর্মধারায় সমাসের সমস্ত পদ গঠনের সময় ব্যাসবাক্যের মধ্য থেকে এক বা একাধিক প্রধানপদ লুপ্ত হয়ে যায় তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারায় বলে।

উদাহরণ - পলমিশ্রিত অন্ন = পলান্ন

ধর্ম রক্ষার্থ ঘাট = ধর্মঘাট

মৌসংগ্রহকারী মাছি = মৌমাছি

তুলনামূলক কর্মধারায় : যে কর্মধারায় সমাসের ব্যাসবাক্যে একটি তুলনা থাকে তাকে বলে তুলনামূলক কর্মধারায়।

উদাহরণ - তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র

ঘনের ন্যায় কৃষ্ণ = ঘনকৃষ্ণ

উপমিত কর্মধারায় সমাস : যে কর্মধারায় সমাসের ব্যাসবাক্য উপমেয় এবং উপমান উভয়েই উপস্থিত থাকে এবং সাদারন ধর্ম থাকে অনুপস্থিত তাকে বলে উপমিত কর্মধারায় সমাস।

উদাহরণ - মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র

কাচের ন্যায় পোকা = কাচপোকা

উপমান কর্মধারায় সমাস : যে কর্মধারায় সমাসের ব্যাসবাক্য উপমান ও সাধারণ ধর্ম উপস্থিত থাকে কিন্তু স্বয়ং উপমেয় থাকে অনুপস্থিত তাকে বলে উপমান কর্মধারায় সমাস।

উদাহরণ - সুধার ন্যায় ধবল = সুধাধবল

আবলুসের মতো কালো = আবলুসকালো

রূপক কর্মধারায় সমাস :

প্রবল সাদৃশ্যবশত উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পিত হয় যে তুলনামূলক কর্মধারায় সমাসে তাকে বলে রূপক কর্মধারায় সমাস। উদাহরণ -

মনরূপ মাঝি = মনমাঝি

মৃত্যুরূপ ফাঁদ = মৃত্যুফাঁদ

কালরূপ সিন্ধু = কালসিন্ধু

■ দ্বিগু সমাস :

যে সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ থাকে এবং পরপদের অর্থ প্রধান হয় তাকে বলে দ্বিগু সমাস।

বাংলায় এই দ্বিগু সমাস দুরকমের-

ক) তাদ্বিতার্থ দ্বিগু

খ) সমাহার দ্বিগু

ক) তদ্ধিতার্থ দ্বিগু : যে দ্বিগু সমাসের শেষে একটি তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ওই প্রত্যয়টি পরপদের অর্থকেই প্রধান করে তোলে তাকে বলে তদ্ধিত দ্বিগু।

উদাহরণ - দ্বি (দুটি) গোয়ের বিনিময়ে ক্রীত = দ্বিগু (দ্বি+গো+উ), সমাসের শেষে 'গো' শব্দের পর উ প্রত্যয়টি যুক্ত হয়েছে। 'উ' টি তদ্ধিত প্রত্যয় এর অর্থ 'বিনিময় ক্রীত'।

সমাহার দ্বিগু : যে দ্বিগু সমাসের সমস্ত পদটি অনেক বস্তু বা পদার্থের সমাহারকে বোঝায় তাকে বলে সমাহার দ্বিগু।

উদাহরণ - সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ

তে (তিন) পান্তরের সমাহার = তেপান্তর

পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী।

■ বহুব্রীহী সমাস :

যে সমাসে সমস্যমান কোনও পদের অর্থই প্রধান হয় না, হয় অন্য কোনও অর্থ প্রধান তাকেই বলে বহুব্রীহী সমাস।

উদাহরণ - শুভ্র মুখ যার = শুভ্রমুখ

শীর্ণকায় যার = শীর্ণকায়

সমানাধিকরন বহুব্রীহির বিশেষভাগ :

১) সংখ্যাপূর্ব বহুব্রীহী : সংখ্যাবাচক বিশেষণ পদ পূর্বপদে বসে যে বহুব্রীহী সমাস গঠন করে তাকে বলে সংখ্যাপূর্ব বহুব্রীহী।

উদাহরণ - বহি ভুজ যার = বহুভুজ

দশ মন (ওজন) যার = দশমনি

তে (তিন) শির যার = তেশিরে

২) ব্যাতিহার বহুব্রীহী : যে বহুব্রীহী সমাসের সমস্ত পদটি এরূপ একটি ক্রিয়া বিনিময়ের ব্যাপরকে বোঝায় তাকে বলে ব্যাতিহার বহুব্রীহী সমাস।

উদাহরণ - দন্ডে দন্ডে যে দ্বন্দ = দন্ডাদন্ডি

লাঠিতে লাঠিতে যে সংঘাত = লাঠালাঠি।

৩) প্রাদি বা উপসর্গপূর্ব বহুব্রীহী : প্র, পরা, বি প্রভৃতি উপসর্গ বাচক অব্যয়গুলি পূর্বপদে বসে যে বহুব্রীহী সমাস গঠন করে তাকে বলে প্রাদি বা উপসর্গ বহুব্রীহী।

উদাহরণ - বি (বিগত) মূল যার = বিমূল

সু (সুন্দর) স্মিত যার = সুস্মিতা

উদ্ (উদ্ধ) বায় যার = উদ্ভায়ু

নঞ্ বা না বহুব্রীহী: নঞ্র্থক বা নাবাচক অব্যয় পূর্বপদে বসে যে বহুব্রীহী সমাস গঠন করে তাকে বলে নঞ্ বা না বহুব্রীহী সমাস।

উদাহরণ - নেই জ্ঞান যার = অজ্ঞা

নি: দ্বিধা যার = নির্দ্বিধ

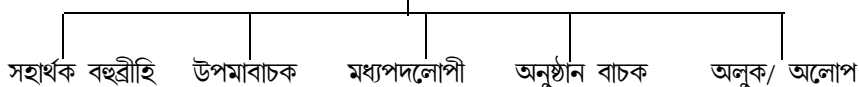
ব্যধিকরন বহুব্রীহী : যে বহুব্রীহী সমাসের পূর্বপদ ও পরপদ উভয়েই বিশেষ্য এবং ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত তাকে বলে ব্যধিকরন বহুব্রীহী সমাস।

উদাহরণ - শূল পানিতে যার = শূলপানি

বেদনা অন্তে যার = বেদনান্ত

অশ্রু মুখে যার = অশ্রুমুখী

ব্যধিকরন বহুব্রীহী



১) সহার্থক বহুব্রীহী: সহার্থক অব্যয় (সহ ওস) পূর্বপদে বসে যে বহুব্রীহী সমাস গঠন করে তাকে সহার্থক বহুব্রীহী সমাস বলে।

উদাহরণ - মানের সহিত বর্তমান = সমাস

বিশেষের সহিত বর্তমান = সবিশেষ

২) উপমানবাচক বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে কোন তুলনা ব্যবহার করা হয় তাকে বলে উপমাবাচক বহুব্রীহি।

উদাহরণ - কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষি

চাঁদের ন্যায় বদন যার = চাঁদবদনি

৩) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদ গঠনের সময় ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী প্রধান এক বা একাধিক পদ লুপ্ত হয়ে যায় তাকে বলে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি।

উদাহরণ - চাঁদের ন্যায় সুন্দর বদন যার = চাঁদবদনি

পাঁচ সের ওজন যার = পাঁচসেরি

৪) অনুষ্ঠানবাচক বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদটি বিশেষ কোন ও অনুষ্ঠানকে বোঝায় তাকে বলে অনুষ্ঠান বাচক বহুব্রীহি।

উদাহরণ - অন্নের প্রশন (বক্ষন) হয় যে অনুষ্ঠানক্ষেত্রে = অন্নপ্রাশন

হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি

৫) অলুক/ অলোপ বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্ত পদ গঠনের সময় ব্যাসবাক্যের পূর্বপদ বা পরপদের বিভক্তির লোপ হয় না তাকে বলে অলুক বা অলোপ বহুব্রীহি।

উদাহরণ - গায়ে হলুদ দেওয়া যে অনুষ্ঠান = গায়ে হলুদ।

লকড়ি ঘাড়ে যার = লকড়িঘাড়ে

চাঁদ কপালে যার = চাঁদকপালে

ছাতা হাতে যার = ছাতাহাতে।

■ অব্যয়ীভাব সমাস :

যে সমাসের পূর্বপদে অব্যয় থাকে এবং সেই অব্যয়ের অর্থই প্রধান হয়ে ওঠে তাকে বলে অব্যয়ীভাব সমাস।

১) অভাবার্থে - মিলের অভাব = গরমিল

আমিষের অভাব = নিরামিষ

ভাতের অভাব = হাভাত

২) সমীপ্যার্থে - কূলের সমীপে = উপকূল

পদের সমীপে = উপপদ

৩) বীপসা/ পুনঃপুনর অর্থে -

দিন দিন = প্রতিদিন

বছর বছর = ফিবছর

৪) ক্ষুদার্থে -

ক্ষুদ্র গ্রহ = উপগ্রহ

ক্ষুদ্র বৃক্ষ = উপবৃক্ষ

৫) সাদৃশ্যার্থে -

মূর্তির সদৃশ = প্রতিমূর্তি

পতির সদৃশ = উপপতি

৬) ব্যাপ্তার্থে -

জীবন ব্যোপে = আজীবন

মাস ব্যোপে = মাসভর

৭) সীমার্থে -

কর্ন পর্যন্ত = ব্যনকর্ন
সমুদ্র পর্যন্ত = আসমুদ্র

৮) অতিক্রমার্থে -

বেলাকে অতিক্রম করে = উদ্বেল
মেনর বাইরে = উন্মন

৯) অনতিক্রমার্থে -

ভাগকে অতিক্রম না করে- যথাভাগে
ইষ্টকে অতিক্রম না করে- যথেষ্ট

১০) সাফল্যার্থে -

ঝুড়িকেও বাদ না দিয়ে = ঝুড়ি সুদ্ধ
বাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকাল = আবালবৃদ্ধবানিতা

১১) পশ্চাদার্থে -

রথের পশ্চাৎ = অনুরথ
মরনের পশ্চাৎ = অনুসরণ

১২) যোগার্থে -

রূপের যোগ্য = অনুরূপ
বলের যোগ্য = অনুবল

১৩) অভিযুখ্যার্থে -

অক্ষির অভিযুখে = প্রত্যক্ষ
বাতের অভিযুখে = প্রতিবাত

১৪) অধিকারার্থে -

আত্মাকে অধিকার করে = আধাত্মা
কৃষকে অধিকার করে = অধিকৃষক

১৫) বিপরীত্যার্থে -

ফলের বিপরীত = প্রতিফল
ধ্বনির বিপরীত = প্রতিধ্বনি

১৬) অন্তরালার্থে -

অক্ষির অন্তরালে = পরোক্ষ

১৭) আতিশয্যার্থে -

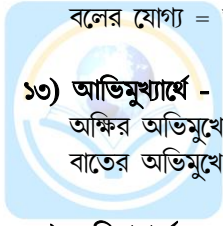
হতাশার আতিশয্য = হা-হতাশ

১৮) বিভক্তির অর্থে -

আত্মায় = আধাত্মা

১৯) পূর্ব অর্থে -

মাতামহের পূর্বে = প্রমাতামহ



Teachinns
Text with Technology

■ নিত্যসমাস :

যে সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য নিম্নয় করা যায় না বা ব্যাসবাক্য করতে গেলে অন্য কোনও পদের সাহায্যে নিতে হয় তাকে বলে নিত্য সমাস।

উদাহরন - অন্য যুগ = যুগান্তর

অন্য ভাব = ভাবান্তর

কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র

তার জন্য = তদর্থ

কেবল হাঁটা = হাঁটাহাটি।

১.৬.৩ প্রত্যয় :

- ‘প্রত্যয়’ শব্দটির বুৎপত্তি হল - ‘প্রতি-√ই+অচ্’। ‘ই’ ধাতুর অর্থ ‘যাওয়া’। ‘প্রতি’ শব্দের অর্থ ‘দিকে’। সুতরাং ‘প্রত্যয়’ শব্দটির অর্থ ‘দিকে গমন’....‘শব্দগঠনের দিকে গমন’‘শব্দ গঠনের পদ্ধতি’।
- প্রত্যয় হল কতগুলি চিহ্ন, বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যারা ধাতু বা শব্দের শেষে বসে নতুন নতুন শব্দ এবং নতুন নতুন ধাতু গঠন করে।

যথা - √কৃ+ ক্ত=কৃত

এখানে ‘√কৃ’র সঙ্গে নানা চিহ্ন যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করেছে।

গুণ + ইন = গুণিন > গুণী

এখানে ‘গুণ’ শব্দের শেষে নানা চিহ্ন যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করেছে।

√শ্রু+নিচ্=√শ্রাবি

√কৃ+নিচ্= √কারি

এখানে নতুন নতুন ধাতু গঠিত হয়েছে।

- কতকগুলি প্রত্যয় ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে। এদের বলে ধাতু প্রত্যয় বা কৃৎ প্রত্যয়। যেমন- ক্ত (ত), ক্তিন্ (তি) অনট্ (অন) তব্য, অনীয়, যৎ, নাৎ, ক্যপ এরা সব কৃৎ প্রত্যয়।
- কতকগুলি প্রত্যয় শব্দের শেষে যুক্ত নতুন নতুন ধাতু গঠন করে। এদের বলে ধাতুব্যব প্রত্যয়। নতুন ধাতুটির অব্যব অর্থাৎ শরীরের মধ্যেই প্রত্যয়টি অবস্থান করে বলে এদের নাম ধাতুব্যব।

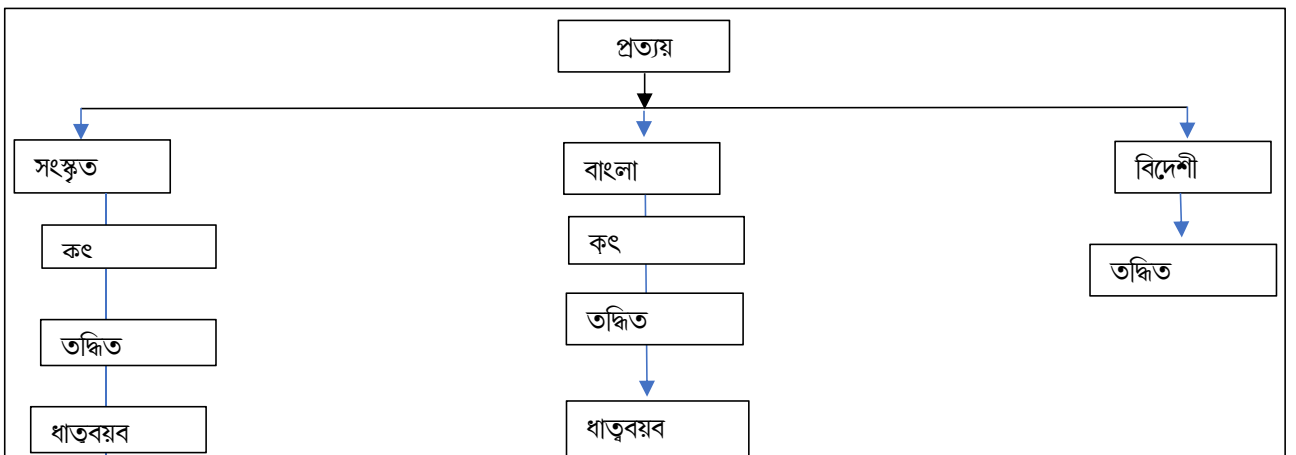
যথা- √কৃ+নিচ্ (ই) = কারি, নতুন ধাতু ‘কারির-মধ্যেই ‘নিচ্’ এর ‘ই’ টি রয়েছে। তাই ‘নিচ্’ ধাতুব্যব প্রত্যয়।

- উৎসের দিক থেকে প্রত্যয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায় -

ক) সংস্কৃত প্রত্যয় : ক্ত, ক্তিন্, অনট্, ইত্যাদি। সংস্কৃত অধিত প্রত্যয় - ষ্, ষি, ষ্য, ষেয়, ষয়ন ইত্যাদি। সংস্কৃত ধাতুব্যব প্রত্যয়-নিচ্, সন্, যঙ ইত্যাদি।

খ) বাংলা কৃৎপ্রত্যয় : অ,আ,অন, অন্ত ইত্যাদি। বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় আমি/মি,আই, উয়া....ও ইত্যাদি। বাংলা ধাতুব্যব প্রত্যয়-আ, আনো ইত্যাদি।

গ) বিদেশী তদ্ধিত প্রত্যয় : ওয়ালা, দার, বাজ, সহ, দান, গিরি ইত্যাদি। বিদেশী কৃৎ ও ধাতুব্যব প্রত্যয় বাংলায় নেই।



বোঝায়। ধাতুর শেষে যুক্ত প্রত্যয় হলো ‘ক্+ত’ প্রত্যয়।

‘ক্’ প্রত্যয়ের মধ্যে তিনটি বর্ণ আছে - ‘ক্+ত্+অ’ এদের মধ্যে ‘ক্’ চলে যায় থাকে ‘ত’। সুতরাং ‘ত’ ই হল ‘ক্’ প্রত্যয়ের চিহ্ন যা ধাতুর শেষে যুক্ত হয়। ‘অতীত’ অর্থে ‘ত’ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

উদাহরণ - যা হয়ে গেছে = ভূ + ত = ভূত।

■ ‘ত’ চিহ্নটি ধাতুর শেষে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে -

- $\sqrt{\text{ভূ}} + \text{ত} = \text{ভূত}$
প্র - $\sqrt{\text{ভূ}} + \text{ত} = \text{প্রভূত}$
অনু - $\sqrt{\text{ভূ}} + \text{ত} = \text{অনুভূত}$
নঞ্ (অ)- $\sqrt{\text{ভূ}} + \text{ত} = \text{অভূত}$
- $\sqrt{\text{ক্}} + \text{ত} = \text{কৃত}$
প্র = $\sqrt{\text{ক্}} + \text{ত} = \text{প্রকৃত}$
দুঃ - $\sqrt{\text{ক্}} + \text{ত} = \text{দুষ্কৃত}$
দুঃ + কৃত = দুষ্কৃত - সন্ধিতো
সম্ - $\sqrt{\text{ক্}} + \text{ত} = \text{সংস্কৃত}$
নঞ্ - $\sqrt{\text{ক্}} + \text{ত} = \text{অকৃত}$
- $\sqrt{\text{নী}} + \text{ত} = \text{নীত}$
অ - $\sqrt{\text{নী}} + \text{ত} = \text{আনীত}$
নিঃ - $\sqrt{\text{নী}} + \text{ত} = \text{নিগীত}$
নত্বের নিয়ম প্রযুক্ত হয়েছে।
- $\sqrt{\text{শু}} + \text{ত} = \text{শ্রুত}$
অতি - $\sqrt{\text{শু}} + \text{ত} = \text{অতিশ্রুত}$
- $\sqrt{\text{খ্যা}} + \text{ত} = \text{খ্যাত}$
প্রতি - আ - $\sqrt{\text{খ্যা}} + \text{ত} = \text{প্রত্যাখ্যাত}$
- $\sqrt{\text{ম্}} + \text{ত} = \text{মৃত}$
অনু - $\sqrt{\text{ম্}} + \text{ত} = \text{অনুমৃত}$
- $\sqrt{\text{স্ম্}} + \text{ত} = \text{স্মৃত}$
অনু - $\sqrt{\text{স্ম্}} + \text{ত} = \text{অনুস্মৃত}$
- $\sqrt{\text{ধ্}} + \text{ত} = \text{ধৃত}$
উদ্ - $\sqrt{\text{ধ্}} + \text{ত} = \text{উদ্ধৃত}$
- $\sqrt{\text{হ্}} + \text{ত} = \text{হৃত}$
আ - $\sqrt{\text{হ্}} + \text{ত} = \text{আহৃত}$
- $\sqrt{\text{ক্রী}} + \text{ত} = \text{ক্রীত}$
পরি - $\sqrt{\text{ক্রী}} + \text{ত} = \text{পরিক্রীত}$
- $\sqrt{\text{চি}} + \text{ত} = \text{চিত}$
পরি - $\sqrt{\text{চি}} + \text{ত} = \text{পরিচিত}$
- $\sqrt{\text{জি}} + \text{ত} = \text{জিত}$
সু - জি + ত = সুজিত
- $\sqrt{\text{জ্ঞা}} + \text{ত} = \text{জ্ঞাত}$
বি - $\sqrt{\text{জ্ঞা}} + \text{ত} = \text{বিজ্ঞাত}$
- $\sqrt{\text{ভী}} + \text{ত} = \text{ভীত}$
অতি - $\sqrt{\text{ভী}} + \text{ত} = \text{অতিভীত}$
- $\sqrt{\text{দ্}} + \text{ত} = \text{দৃত}$

- আ - √দ + ত = আদত
- √দ্র + ত = দ্রুত
অভি - √দ্র + ত = অভিদ্রুত
 - √ধু + ত = ধুত
অব - √ধু + ত = অবধুত
 - √পু + ত = পুত
অতি - √পু + ত = অতিপুত
 - √প্ল + ত = প্লুত
আ - √প্ল + ত = আপ্লুত
 - √শ্রি + ত = শ্রিত
আ - √শ্রি + ত = আশ্রিত
 - √ভূ + ত = ভূত
নি - √ভূ + ত = নিভূত
 - √বৃ + ত = বৃত
সম্ + √বৃ + ত = সংবৃত
 - √বা + ত = বাত
√ভা + ত = ভাত
√গ্না + ত = গ্নাত
√স্তু + ত = স্তুত
√স্ম + ত = স্মিত
√হ + ত = হত

‘ত’ প্রত্যয়টি যুক্ত হওয়ার সময় ধাতুর শেষে ই-কারের আগম হয়।

- √লিখ্ + ত = লিখিত
- √পূজ্ + ত = পূজিত
- √সেব্ + ত = সেবিত
- √অর্চ্ + ত = অর্চিত
- √পঠ্ + ত = পঠিত
- √পত্ + ত = পতিত
- √অর্জ্ + ত = অর্জিত
- √অর্থ্ + ত = অর্থিত
- √অশ্ + ত = অশিত
- √ভঙ্গ্ + ত = ভঙ্গিত
- √খাদ্ + ত = খাদিত
- √ইক্ষ্ + ত = ইক্ষিত
- √কথ্ + ত = কথিত
- √কম্প্ + ত = কম্পিত
- √কাজ্ + ত = কাজিত
- √কাশ্ + ত = কাশিত
- √কুপ্ + ত = কুপিত
- √কৃজ্ + ত = কৃজিত

√গজ্ + ত = গর্জিত
 √ঘট্ + ত = ঘটিত
 √গঠ্ + ত = গঠিত
 √চল্ + ত = চলিত
 √চর্ + ত = চরিত
 √চিহ্ + ত = চিহ্নিত
 √চেষ্ট্ + ত = চেষ্টিত
 √জল্ + ত = জলিত
 √জীব্ + ত = জীবিত
 √জন্ + ত = জনিত
 √ধাব্ + ত = ধাবিত
 √নন্দ্ + ত = নন্দিত
 √পাল্ + ত = পালিত
 √পীড়্ + ত = পীড়িত

[‘ড্’, ‘ঢ্’, ‘ষ্’, যখন দুটি স্বরবর্ণের মাঝখানে পড়ে যায় তখন তারা যথাক্রমে ‘ড্’, ‘ঢ্’, ‘ষ্’ হয়ে যায়]

√ফল্ + ত = ফলিত
 √বাহ্ + ত = বাধিত
 √ভাষ্ + ত = ভাষিত
 √ভাস্ + ত = ভাসিত
 √মন্ত্র্ + ত = মন্ত্রিত
 √মিল্ + ত = মিলিত
 √মীল্ + ত = মীলিত
 √যাচ্ + ত = যাচিত
 √রক্ষ্ + ত = রক্ষিত
 √রচ্ + ত = রচিত
 √রাজ্ + ত = রাজিত
 √রাধ্ + ত = রাধিত
 √বন্দ্ + ত = বন্দিত
 √বাঞ্ছ্ + ত = বাঞ্ছিত
 √হিন্স্ / হিংস্ + ত = হিংসিত

[হনস্-হিংস্ সন্ধিতে। পদ মধ্যস্থ ‘ন’ ৎ হয় যদি পরে শ্, ষ্, স ও হ থাকে, ফলে হিন্সিত= হিংসিত]

ধাতুর শেষে ম/ন্ অনেক সময় লোপ পায়

√গম্ + ত = গত
 √নম্ + ত = নত
 √তন্ + ত = তত
 √হন্ + ত = হত

ধাতুর শেষে 'ন' থাকলে এবং তার লোপ হলে অনেক সময় ধাতুর প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়

$$\sqrt{\text{খন}} + \text{ত} = \text{খাত}$$

$$\sqrt{\text{জন}} + \text{ত} = \text{জাত}$$

ধাতুর শেষে 'ম' অনেক সময় ত, এর সঙ্গে সন্ধিতে 'ন' হয়, ধাতুর প্রথমস্বরের বৃদ্ধিও হয়।

$$\sqrt{\text{কম}} + \text{ত} = \text{কান্ত}$$

$$\sqrt{\text{রুম}} + \text{ত} = \text{রুান্ত}$$

$$\sqrt{\text{দম}} + \text{ত} = \text{দান্ত}$$

ধাতুর শেষে দ থাকলে সাধাসরন 'দ+ত' মিলে 'ন্ন' হয় অর্থাৎ দ + ত = নন

$$\sqrt{\text{অদ}} + \text{ত} = \text{অন্ন/জন্ম}$$

$$\sqrt{\text{ক্লিদ}} + \text{ত} = \text{ক্লিন্ন}$$

ধাতুর শেষে 'হ' থাকলে তার সঙ্গে 'ত' যুক্ত হয়ে সাধারনত 'র' হয়,

$$\sqrt{\text{লিহ}} + \text{ত} = \text{লীঢ়}$$

$$\sqrt{\text{মূহ}} + \text{ত} = \text{মূঢ়/মুগ্ধ}$$

ধাতুর শেষে 'ঈ' (দীর্ঘ) থাকলে 'ত' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ঈর্ন' হয় অর্থাৎ

$$\sqrt{\text{ঈ}} + \text{ত} = \text{ঈর্ন}$$

$$\sqrt{\text{কূ}} + \text{ত} = \text{কীর্ন}$$

ত যুক্ত হলে ধাতুর প্রথম অঙ্ক:স্থ 'ব' উ/উতে পরিণত হয়

$$\sqrt{\text{বচ্}} + \text{ত} = \text{উভ্}$$

ধাতুবয়ব প্রত্যয়যুক্ত ধাতুর ক্ষেত্রেও 'ত' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে।

$$\sqrt{\text{ভূ}} + \sqrt{\text{নিচ্}} + \text{ত} = \text{ভাবিত}$$

$$\sqrt{\text{পা}} + \text{সন্} + \text{ত} = \sqrt{\text{পপাস্}} + \text{ত} = \text{পিপাসিত}$$

জিন/তি প্রত্যয়

ধাতুর শেষে সরাসরি যুক্ত ভক্ত

$$\sqrt{\text{ভজ্}} + \text{তি} = \text{ভক্তি}$$

$$\sqrt{\text{মুচ্}} + \text{তি} = \text{মুক্তি}$$

$$\sqrt{\text{সৃজ্}} + \text{তি} = \text{সৃষ্টি}$$

ধাতুর শেষে 'ম্ + ন' থাকলে সাধারনত দুটি বর্ণের লোপ হয় -

$$\sqrt{\text{গম্}} + \text{তি} = \text{গতি}$$

ধাতুর শেষে ম্+ন্ সবসময় লোপ হয় না। অনেক সময় 'ম্+তি' যুক্ত হয়ে 'স্তি' হয় সন্ধিতে

$$\sqrt{\text{কম্}} + \text{তি} = \text{কান্তি}$$

$$\sqrt{\text{সন্জ্}} + \text{তি} = \text{সন্তি}$$

'অনট্' প্রত্যয়

'ট' প্রত্যয় চলে যায় থাকে 'অন' বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।

$$\sqrt{\text{অঙ্ক}} + \text{অনট্} = \text{অঙ্কন}$$

√হা + অনট্ = হরন

√মদ + নিচ + অনট্ = মাদন

ঘঞ প্রত্যয়

√কম্ + ঘঞ = কাম

√ছিদ্ + ঘঞ = ছেদ

বিবিধ

√অদ্ + ঘঞ = ঘাস

√চ + ঘঞ = কায়

√ভনজ্ + ঘঞ = ভঙ্গ

√সনজ্ + ঘঞ = সঙ্গ

‘অচ’ প্রত্যয়

√অক্ষ + অচ্ = অক্ষ

√ধৃ + অচ্ = ধর

‘অপ্’ প্রত্যয়

√জপ্ + অপ্ = জপ

√নু + অপ্ = নব

‘তব্য’ প্রত্যয়

দা + তব্য = দাতব্য

শত্, শানচ - প্রত্যয়

√চল্ + শত্ = চলৎ

√বৃৎ + শানচ্ = বর্তমান

অল্ প্রত্যয়

জি + অল্ = জয়

বাংলা কৃৎ প্রত্যয় :-

‘অ’ প্রত্যয় এই প্রত্যয়টি ধাতুর শেষে বসে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদ গঠন করে সুতরাং এরা ক্রিয়ার কাজটিকে বোঝায়

√কাট্ + অ = কাঁদ

√খুজ্ + ত = খোঁজ

√ঘির্ + অ = ঘের

‘অন’ - প্রত্যয়

√কাঁদ্ + অন = কাঁদন

√ধর্ + অন = ধরন

√সৃজ্ + অন = সৃজন

অন্ত-প্রত্যয় :- যে ক্রিয়া চলছে সেই চলমানতার অর্থে ধাতুর শেষে ‘অন্ত’ প্রত্যয় হয়।

√ছুট্ + অন্ত = ছুটন্ত

√বাড্ + অন্ত = বাড়ন্ত

√জীব্ + অন্ত = জীবন্ত

‘আ’ প্রত্যয়:- ‘আ’ প্রত্যয়টির সাহায্যে বাংলায় বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠিত হয়। ক্রিয়ার কাজ বোঝাতে বা অন্য অর্থে ‘আ’ প্রত্যয়ের ব্যবহার বাংলা ভাষার লক্ষ্য করা যায়।

√চন্ + আ = চলা

√বন্ + আ = বলা

√বক্ + আ = বকা

আই - প্রত্যয় :- ক্রিয়ার কাজ বা ভাব অর্থে ধাতুর শেষে ‘আই’ প্রত্যয় বসে বিশেষ্য পদ গঠন করে।

√বন্ + আই = বলাই

√ধুন্ + আই = ধোলাই

‘আও’- প্রত্যয় :- ক্রিয়ার কাজ বা ভাব বোঝাতে ধাতুর শেষে ‘আও’ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

√ফন্ + আও = ফলাও

√ঘির্ + আও = ঘেরাও

‘ই’ প্রত্যয় :- ক্রিয়ার ভাব বা কাজ বোঝাতে ধাতুর শেষে ‘ই’ প্রত্যয় হয়।

√হাঁচ + ই = হাঁচি

√কাস্ + ই = কাসি

‘ইয়ে’ প্রত্যয় :- দক্ষ বা নিপুন অর্থে ধাতুর শেষে বাংলায় ‘ইয়ে’ প্রত্যয় হয়।

√বন্ + ইয়ে = বলিয়ে

√ক্ + ইয়ে = কইয়ে

আরি/উরি প্রত্যয় :- স্বভাব/ শীল/ বৃত্তি প্রভৃতি অর্থে ধাতুর শেষে আরি/উরি প্রত্যয় হয়।

√ভিখ্ + আরি = ভিখারি

√ডুব্ + উরি = ডুবুরি

এন - প্রত্যয় :- দক্ষ বা স্বভাব অর্থে ‘এন’ প্রত্যয় ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ গঠন করে।

√গা + এন = গায়েন

আন - প্রত্যয় :- ক্রিয়ার ভাব বা কাজ বোঝাতে ধাতুর শেষে ‘আন’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য পদ গঠন করে।

√চাল্ + আন = চালান

আনো প্রত্যয় :-

√জাল্ + আনো = জালানো

‘না’- প্রত্যয়:

√ভাব্ + না = ভাবনা

‘ইত’ - প্রত্যয় :-

√জান্ + ইতি = জানিত

আনি/উনি প্রত্যয়

√ছল্ + অনি = ছলনি

√বান্ + উনি = বাধুনি

‘ইত’ প্রত্যয়

√কর্ + ইত = করিত

‘উক’ প্রত্যয়

√মিশ্ + উক = মিশুক

‘তা’ প্রত্যয়

√জান্ + তা = জান্তা

‘তি’ প্রত্যয়

√চড়্ + তি = চড়তি

তদ্ধিত প্রত্যয় :-

শব্দের উত্তরে বা শেষে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয় তাদের বলে; তদ্ধিত প্রত্যয়।

লোক + যনিক = লৌকিক

সত্ত্ব + যনিক = সাত্ত্বিকতা

অপত্যার্থক প্রত্যয় :-

‘অপত্য’ শব্দটি ‘নঞ’ + পিত্ + যৎ’ প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত, অর্থ হল যার জন্য পতন হয় না। যে প্রত্যয়গুলি ‘অপত্য’ অর্থাৎ পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, প্রভৃতি বংশধর এমনকী শিষ্য-শিষ্যা, ভক্ত, ভক্তা প্রভৃতিকে বোঝায় তাদের বলে অপত্যার্থক প্রত্যয়।

যেমন - জ্ঞ, ষি, ষ্যা, ষেয়, ষয়ান প্রভৃতি

মজুর পুত্র/সন্তান = মনু + ষ = মানব

বিদেহের কন্যা = বিদেহ + ষ + ঙ্গী (স্ত্রী) = বৈদেহী

দিতির পুত্র = দিতি + ষ্য = দৈত্য

সরমার পুত্র = সরমা + ষেয় = সারমেয়

অশ্বলের পুত্র = অশ্বল + ষয়ান = আশ্বলায়ন

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

‘আ’ প্রত্যয় : অস্তি স্বার্থ অনাদর সাদৃশ্য উৎপন্ন প্রভৃতি অর্থে

√তেল + আ = তেলা

√জন + আ = জানা

আই - প্রত্যয় : ভাব, আদর, সম্বন্ধ বোঝাতে

√বড় + আই = বড়াই

আল, আলো, আলি, আলী :

আছে অর্থে দেশ, পেশা, ব্যবসায় ভাব ইত্যাদি বোঝাতে।

√ঝাঁজ + আলো = ঝাঁজালো

‘আরী’ প্রত্যয় : বৃত্তি বজাতে

√পূজা + আরী = পূজারী

‘ই’ প্রত্যয়

√মাস্টার + ই = মাস্টারি

‘ঙ’ প্রত্যয়

√ঢাক + ঙ = ঢাকী

‘ইয়া’ প্রত্যয়

√বানর + ইয়া = বানুচর

আমি, আম : ভাব বা অনুকরণ অর্থে

√পাকা + আম = পাকামো

বিদেশী অঙ্কিত প্রত্যয় :-

আনা, আনি, গিরি, নিবস -

আচরণ, ভাষা বৃত্তি অর্থে

বাবু + আনা = বাবুয়ায়না

কেরানী + গিরি = কেরানী - গিরি

দার - প্রত্যয় : যুক্ত পাত্র বা বৃত্তিধারী অর্থে

পেশা + দার = পেশাদার

‘খানা’ - প্রত্যয় - স্থান অর্থে

ডাক্তার খানা = ডাক্তারি খানা

১.৬.৪. কারক ও বিভক্তি :

১. কারক (Case) :

‘ক্রিয়ান্বটি কারকম্’- পাণিনি

বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামপদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক (Case) বলে।

যেমন : ‘প্রচন্ড ক্ষিদের রবি হেঁসেলে হাঁড়ি থেকে দু হাত দিয়ে ভাত খেল।’

এখানে -

১) ক্রিয়াপদ (সমাপিকা) = খেল।

২) বিশেষ্য পদ = ক্ষিদে, রবি, হেঁসেল, হাঁড়ি, হাত, ভাত।

‘খেল’ - এই ক্রিয়াটি এই বাক্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারন- এরই সঙ্গে উক্ত ছ-টি বিশেষ্য পদ নানাভাবে সম্পর্কান্বিত হয়েছে। যেমন -

১) কে খেল? - রাম। খেল-র সঙ্গে রামের কতৃ সম্পর্ক। তাই রাম = কর্তৃকারক।

২) কী খেল? - ভাত। খেল-র সঙ্গে ভাতের কর্ম সম্পর্ক। তাই ভাত = কর্মকারক।

৩) কী দিয়ে খেল? - হাত দিয়ে। খেল-র সঙ্গে হাতের করন সম্পর্ক। হাত = করনকারক।

৪) কোথা থেকে খেল? - হাঁড়ি থেকে। খেল-র সঙ্গে হাঁড়ির অপাদান সম্পর্ক। হাঁড়ি=অপাদানকারক।

৫) কোথায় খেল? - হেঁসেলে। খেল-র সঙ্গে হেঁসেলের অধিকরন সম্পর্ক। হেঁসেল = অধিকরণ।

সুতরাং ‘খেল’ ক্রিয়াটির সঙ্গে বিশেষ্য পদগুলি কোনো না কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে, আর তার জন্যেই প্রতিটি বিশেষ্যপদ কারক হয়েছে।

২. বিভক্তি (Case-ending/Case termination/Inflection) :

বিভক্তি হলো কারকজ্ঞাপক চিহ্ন।

যে সব শব্দ বা শব্দানুর (চিহ্নের) যোগে বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য পদগুলির সম্পর্ক নির্ণীত হয়, তাদের বিভক্তি বলে।

যেমন - প্রচন্ড ক্ষিদেয় রবি হেঁসেলে হাঁড়ি থেকে দু হাত দিয়ে ভাত খেল-

এখানে -

১) ক্রিয়াপদ=খেল

২) বিশেষ্যপদ= ক্ষিদে, রবি, হেঁসেল, হাঁড়ি, হাত, ভাত।

লক্ষণীয় যে - এখানে প্রতিটি বিশেষ্য পদের সঙ্গে কিছু না কিছু শব্দ বা শব্দানু (= চিহ্ন) যুক্ত হয়েছে।

- ১) ক্ষিদে- এর সঙ্গে ‘য়’ (ক্ষিদে + য়) - ‘য়’ এখানে শব্দানু
- ২) হৈসেল - এর সঙ্গে ‘এ’ (হৈসেল + এ) - ‘এ’ এখানে শব্দানু
- ৩) হাত - এর সঙ্গে যুক্ত ‘দিয়ে’ (হাত + দিয়ে) - ‘দিয়ে’ এখানে শব্দ
- ৪) রবি - এ শব্দে কোনো শব্দানু বা চিহ্ন যুক্ত হয়নি
- ৫) ভাত - এ শব্দে কোনো শব্দানু বা চিহ্ন যুক্ত হয়নি

সুতরাং দেখছি - উল্লিখিত প্রথম চারটি বিশেষ্যের সঙ্গে কিছু না কিছু শব্দ বা শব্দানু যুক্ত হয়েছে এবং যুক্ত হওয়ার ফলেই বাক্যটিতে ক্রিয়াটির (খেল) সঙ্গে বিশেষ্য পদগুলির সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে। তাই এই -‘য়’, ‘এ’, দিয়ে - তিনটি শব্দ বা শব্দানু হলো বিভক্তি।

বাংলা বিভক্তি সংস্কৃত বা প্রাকৃত বিভক্তির বিকৃতিতে জন্মেছে। জন্মসূত্র অনুসারে, বাংলা বিভক্তি দু রকমের -

- ১) বিভক্তিজাত বিভক্তি - ‘এ’। এটি প্রধান ভারতীয় আর্যভাষা থেকে এসেছে।
- ২) অনুসর্গজাত বিভক্তি - ‘ক’, ‘ত’, ‘র’। এগুলি অনুসর্গীয় শব্দের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

বাংলায় বিভক্তি বলতে ঐ চারটি। তবে এদের পারস্পরিক যোগে আরো কিছু বিভক্তির জন্ম - কে, তে, রে, এতে, কার, কের, য, য়ো। এছাড়া যেখানে বিভক্তির কোনো চিহ্ন নেয়, সেখানে শূন্য (০) বিভক্তিও কল্পিত হয়েছে। যেমন -

- ১। শূন্য (০) বিভক্তি- চন্ডীদাস গান গায়।
- ২। ‘এ’ বিভক্তি - গাইল চন্ডীদাসে।
- ৩। ‘ক’ বিভক্তি - মতি ঐ ঠাকুরক। কে,- চন্ডীদাসকে ডাকো।
- ৪। ‘ত’ বিভক্তি - এ রূপোতে কিছুই হবে না।
- ৫। ‘র’ বিভক্তি - বাবার শরীর ভালো নয়। তোমার লাগিয়া ফিরি দেশে দেশে।

অনুসর্গ :

বিভক্তি ছাড়াও আরো কিছু শব্দ আছে, যেগুলি বিশেষ্য পদের পরে বসে বিশেষ্যটির কারক-অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলিকে ‘অনুসর্গ’ বলে। এ শব্দগুলি হলো- দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক, সঙ্গে, সনে, জন্য, বিনা, হতে, থেকে, চেষ্টে, কাছে, নিকটে, মধ্যে প্রভৃতি। স্মরণীয় যে ‘বিভক্তি’ হলো শব্দানু-তার নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। ‘অনুসর্গ’ হলো শব্দ- তার নিজস্ব অর্থ আছে। যেমন - তোর দ্বারা এ কাজ হবে না। কী জন্য দুঃখ করিস? কানু বিনা রাই থাকিতে পারে কি!

এখানে - ‘দ্বারা’ মানে সাহায্য, ‘জন্য’ = কারণ (Why), ‘বিনা’ = ব্যতীত (Without)। অর্থাৎ অনুসর্গগুলির নিজস্ব অর্থ আছে। এগুলিও কারক অর্থ প্রকাশ করছে। সুতরাং কারক নির্মাণে বা ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ক নির্মাণে এই ‘বিভক্তি’ ও ‘অনুসর্গ’ একান্ত ও অপরিহার্য।

৩. কারক ও তার বিভক্তি : ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা

১. কারকের ঐতিহাসিক বিবর্তন :

ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য পদের সম্পর্কই হলো কারক। এই সম্পর্ক বৈচিত্রপূর্ণ। তাই কারকের স্বরূপও বিভিন্ন।

- ১। সংস্কৃত ভাষায় কারক হলো ছটি- ১) কর্তৃ, ২) কর্ম, ৩) করণ, ৪) সম্প্রদান, ৫) অপাদান, ৬) অধিকরণ।
- ২। কিন্তু ইংরেজী ব্যাকরণে কারকের সংজ্ঞা একটু আলাদা। বাক্যের অন্তর্গত যে - কোনো বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে অন্য বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্পর্কই যেখানে ‘কারক’ নামে অভিহিত। তদনুসারে ইংরেজী ব্যাকরণে কারক আটটি -
 - ১) কর্তৃ, ২) কর্ম, ৩) করণ, ৪) সম্প্রদান, ৫) আপাদান, ৬) অধিকরণ, ৭) সম্বন্ধপদ, ৮) সম্বোধন পদ।
- ৩। প্রাকৃত ব্যাকরণে কারক তিনটি- ১) কর্তা-কর্ম, ২) করণ-অধিকরণ, ৩) সম্বন্ধ। এইসব সংস্কৃত ব্যাকরণেও সরলীকরণ ঘটেছিল।
- ৪। প্রাচীন বাংলাতেও কারক ঐ তিনটিই ছিল।
- ৫। বাংলা ব্যাকরণে বিশেষতঃ ছাত্র পাঠ্য ব্যাকরণগুলিতে কারক আছে ছটি- ঠিক সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে এগুলি চারটি -
 - ১) কর্তৃ, ২) কর্ম-সম্প্রদান, ৩) করণ-অধিকরণ, ৪) সম্বন্ধ।
- ৬। গঠন প্রকৃতির দিক থেকে কারকগুলিকে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে:
 - ক) মুখ্য কারক- ক্রিয়ার সঙ্গে যাট প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যথা- কর্তৃকারক। এখানে কারকই ক্রিয়াতে নিয়ন্ত্রিত করে।
 - খ) গৌণ বা তির্যক কারক- যাদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়। যথা- কর্ম-সম্প্রদান, করণ-অধিকরণ, সম্বন্ধ - এগুলি ক্রিয়ার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. বিভিন্ন কারকের বিভিন্ন বিভক্তি-ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে :

প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে কারক আছে - ৬টি : কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

এছাড়া কারকের সঙ্গে একযোগে আলোচিত হয়-‘সম্বন্ধপদ’।

বাংলা ব্যাকরণে এক একটি কারকের জন্য এক একটি বিভক্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন -

কর্তৃকারকে - ১ম বা শূন্য বিভক্তি।

কর্মে - ২য়- কে, রে।

করণে - ৩য়- দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক।

সম্প্রদানে - ৪র্থী- কে, রে।

অপাদানে - ৫মী-হতে, থেকে, চেয়ে।

অধিকরণে - ৭মী- এ, তো।

এবং সম্বন্ধ- ৬ষ্ঠী- র, এর।

কিন্তু বাংলা কারকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- একটি কারকের জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তি অন্য কারকেও বসতে পারে।

বাংলা কারকের উদ্ভব সংস্কৃত কারক থেকে। বিভক্তিগুলিও এসেছে সংস্কৃত প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে- প্রাচীন বাংলা হয়ে আধুনিক বাংলায়। আমরা এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে কারকগুলির আলোচনা করছি :

১। কর্তৃকারক (Nominative case):

১. যে করে, সে কর্তা-কর্তৃকারক। সংস্কৃতে কর্তৃকারকে (ক) পুংলিঙ্গ স্ (:) বিভক্তি ও স্ত্রীলিঙ্গে ‘ম’ বিভক্তি ছিল।

স্ত্রীলিঙ্গে বিভক্তি ছিল না। পালি-প্রাকৃতে ‘:’ ‘ম’ পরিণত হয়েছে-‘এ’ বিভক্তিতে।

প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় ‘এ’ বিভক্তি ছিল- ‘রুখের তেতুলি কুস্তীরে খাত্র’। ‘গায়িল চন্দীদাসে’। কিন্তু আধুনিক বাংলায় তা উঠে গেছে। পণ্ডিতেরা একেই বলেছেন - শূন্য বিভক্তি।

যেমন - চন্দীদাস বই পড়ে।

২। কর্মকারক (Accusative Case) :

যা করা হয় তা কর্ম। জাকে করা হয় তাও কর্ম। সংস্কৃতে কর্মে ‘ম’ বিভক্তি ছিল। অপভ্রংশ স্তরে তা উঠে যায়। আধুনিক বাংলায় কর্মে বিভক্তি নেই- বা শূন্য বিভক্তি। যেমন - চন্দীদাস বই পড়ে।

তবে কর্মে অন্য কিছু বিভক্তি আছে- কে, রে, ক, এ, যা। যথা- (তুমি) চন্দীকে গাইতে বল। বধু তোমারে কহিব কি। মতিঐ ঠাকুরক পরিণিবিভা। বৃথা গঞ্জ দশাননে। মা আমায় ঘুরাবি কত।

৩। করণকারক (Instrumental Case) :

যার দ্বারা কিছু করা হয়- তা করণকারক। সংস্কৃতে করণের বিভক্তি চিহ্ন- ‘এন’। বাংলায় তা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে-‘এ’। যথা- নিজের মাংসে হরিন নিজের শত্রু। কলমে লিখছি।

তবে করণে দিয়ে, দ্বারা, কর্তৃক, এ, এর, তে, য়,- বিভক্তি আছে-শূন্য বিভক্তিও আছে। যথা- কলম দিয়ে (দ্বারা) লিখছি। রাম কর্তৃক রাবন বধ হয়। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। পেনসিলের লেখা পড়াই যায় না। টাকাতে কি না হয়। টাকায় কি না হয়। শূন্য বিভক্তি-তাস খেলছি। বেত মারবি না।

৪। সম্প্রদান কারক (Dative Case) :

যাকে নিঃশর্তে কিছু দান করা হয়-সে সম্প্রদান কারক। সাম্প্রতিক ভাষাবিজ্ঞানীরা এর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। গৌন কর্মের সঙ্গে এক করে দেখান। এরও বিভক্তি চিহ্ন কর্মকারকের মতো-কে, রে। যথা- প্রাচীন বাংলাতে-বাহবকে পারাই। ভিক্ষুকেরে ভিক্ষা দিয়া ফিরি।

এছাড়া ৭মী বিভক্তি পাই- অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রান। নিমিত্তার্থে ‘র’ বিভক্তি- পূজার ফুল, যজ্ঞের ঘি।

৫। অপাদান কারক (Ablative Case):

যা থেকে কিছু উৎপন্ন বা নির্গত হয়, তাই অপাদান কারক। কিন্তু সাম্প্রতিক ভাষাবিজ্ঞানীরা এর নিজস্ব ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে-করণ, অধিকরণ ও সম্বন্ধপদের সাহায্যে এর ভাব প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃতে অপাদানের বিভক্তি ছিল- ‘আৎ’। বাংলার তা বিলুপ্ত। প্রাচীন বাংলায় এর বিভক্তি চিহ্ন- ইঁ (খেপইঁ জোইনি লেপ না জাত)- ‘এ’ (জামে কাম কি কামে জাম)-‘ত’(ডোষিত আগলি)।

আধুনিক বাংলায় অপাদানের আছে নানা অনুস্র-হতে, থেকে, চেয়ে। যথা- ‘ঘাট হতে ঘাট কোথা ভেসে যায়’। ‘সকাল থেকে বাদল হলো ফুরিয়ে এলো বেলা’। ‘জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়’। ‘বয়সে ওর চেয়ে পাঁচ গুন বড়’। এছাড়া-

৬ষ্ঠী (৬,এর), ৭মী (৭,একে) বিভক্তিও আছে- বাজারের দই, শহরের লোক, ভূতের ভয়। খনিতে কয়াল নেই। রুচিং শূন্য বিভক্তি-স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখ।

৬। অধিকরণ (Locative Case) :

ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। সংস্কৃতে এর বিভক্তি ছিল-এ, হুঁ, বাংলারট বিভক্তি- ‘এ’ (এটা সংস্কৃতের ‘এ’ বিভক্তি নয়), ‘তে’, ‘এতে’, ‘য়’। যথা- জলে মাছ আছে। সকালে উঠবি। অঙ্কে কাঁচা। শান্তিতে থেকো। আনন্দতে থাক। কলকাতায় থাকিস; গয়ায় পিণ্ড দিলি। এছাড়া- ‘কে’ (আজকে যাবি না); শূন্য বিভক্তি- আজ যাবো না; বর্ধমান যাবো; রবিবার সব ছুটি। প্রাচীন বাংলায় আছে- ‘ত’ (সাক্ষমত চড়িলে), মধ্যবাংলায়-‘রে’ (জীবের সদয় হএগ)।

৭। সম্বন্ধপদ (Possessive/Genitive Case) :

বাংলায় সম্বন্ধপদ কারক নয়-কারন ক্রিয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে কারকের সঙ্গে এর অবস্থান সুনির্দিষ্ট। অথচ ইংরেজিতে সম্বন্ধপদ কারক। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর, অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপর অধিকার থাকলে, তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

সংস্কৃতে এর বিভক্তি ছিল- ‘স্য’ (সস)। প্রাকৃতেও দিল -সস। প্রাচীন বাংলায় আছে তার ধ্বংসাবশেষ -স্য > সস > হ > আ। যেমন- সং ক্ষণস্য > প্রা খনসস > প্রা বাং খনহ। তেমনি মূঢ়স্য > মূঢ়া। সম্প্রতিক বাংলায় এটি বিলুপ্ত। এখন আছে- ‘র’, ‘এর’। এবং ‘র’ থেকে ‘কের’, ‘কার’। যথা- বাংলার মাটি। গাছের ফল। আজকের দিনে অনেক বেকার; সবাইকার মন জোগানো কঠিন।

১.৬.৫ লিঙ্গ :

বাংলার লিঙ্গ বিধির কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই ধরা পড়ে। আমরা জানি বাংলায় লিঙ্গ তিন প্রকার - পুংলিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু ইংরেজিতে এই তিনটি ছাড়া আছে উভয় লিঙ্গ। আজকাল ইংরেজির অনুসরণে বাংলাতেও কেই কেউ উভয়লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তাঁদের মতে সন্তান কবি শিশু ইত্যাদি হল উভয়লিঙ্গ। সংস্কৃত ও জার্মানও লিঙ্গ তিন প্রকার- পুংলিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। আবার হিন্দি ও ফরাসিতে লিঙ্গ শুধু দু’প্রকার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। ফলে যে শব্দকে আমরা ক্লীবলিঙ্গ মনে করি সেগুলি এইসব ভাষায় হয় পুংলিঙ্গ, নয় স্ত্রীলিঙ্গ।

বাংলায় লিঙ্গ অর্থ নির্ভর, অর্থাৎ শব্দের দ্বারা পুরুষ জাতীয় প্রাণীকে বোঝালে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী জাতীয় প্রাণীকে বোঝালে স্ত্রীলিঙ্গ, আর অপ্রাণীবাচক বস্তুকে বোঝালে ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন- বাংলায় ঘোড়া= পুংলিঙ্গ, মেয়ে= স্ত্রীলিঙ্গ, নত=ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গ নির্ণয় বিধিতে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য আছে। অন্যদিকে সংস্কৃত জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষা থেকে বাংলার পার্থক্য আছে। এইসব ভাষায় লিঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ নির্ভর হলেও সর্বদা অর্থনির্ভর নয়, কতকটা শব্দের গঠন নির্ভর এবং কতকটা প্রথা নির্ভর; ফলে অনেক সময় অর্থের সঙ্গে লিঙ্গের সম্বন্ধ থাকে না।

বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে লিঙ্গের প্রভাব খুব বেশি নেই। বিশেষ্য পদের সঙ্গে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ পৃথক পৃথক প্রত্যয় যোগ হয় এবং তার ফলে তাদের পৃথক পৃথক রূপ দাঁড়িয়ে যায়; যেমন - বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, পাঠক-পাঠিকা, সাধক-সাধিকা, বেদে-বেদেনী। বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ হলেও সর্বনামে রূপভেদ হয় না। যেমন - আমি, তুমি, সে প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে একই রূপ থাকে। বাংলায় বিশেষণের ক্ষেত্রেও লিঙ্গের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীয়মান। পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে আমরা কখনো কখনো বিশেষণের রূপ পৃথক হতে দেখি বটে, তবে অনেক ক্ষেত্রে আবার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষণের একই রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- ছোট ছেলে- ছোট মেয়ে। কিন্তু সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষায় বিশেষণের লিঙ্গভেদ বিশেষ্য অনুযায়ী হয়। সংস্কৃতে বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণেরও লিঙ্গ নির্দিষ্ট হয়।

বাংলায় তৎসম বিশেষণের রূপ লিঙ্গভেদে পৃথক হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে বিশেষণের রূপভেদ হয় না। বিশেষণের রূপ নিয়ন্ত্রনে বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব ক্ষীয়মান, আর ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে বাংলায় লিঙ্গের প্রভাব একেবারেই নেই। বাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে লিঙ্গেরও ও কোনো প্রভাব একই। বাংলায় সংস্কৃত, ইংরেজি ও জার্মান ভাষার মতো পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ ক্রিয়ার রূপ নেই।

১.৬.৬ বচন :

বস্তুর সংখ্যা বোঝাতে বচন ব্যবহৃত হয়।

বাংলা রূপতত্ত্বে লিঙ্গের প্রভাব বিশেষ নেই ; কিন্তু বচনের প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। সংস্কৃত বা গ্রীসের মতো বাংলার দ্বিবচনে নেই ; হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষার মতো বাংলায় বচন মাত্র দুটি -

ক) একবচন

খ) বহুবচন।

বাংলায় একবচন ও বহুবচন বিশেষ্যের পৃথক রূপই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত।
উদাহরন -

একবচন	বহুবচন
ছেলে	ছেলেরা
বই	বইগুলি

তবে বিশেষ্যের আগে যেখানে বহুবচনবোধক কোনো বিশেষণ তাকে সেখানে বহুবচন বিশেষ্যের আগে যেখানে বহুবচনবোধক কোনো বিশেষণ থাকে সেখানে বহুবচনে বিশেষ্যের পৃথক রূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলে না। কিন্তু অন্যান্য অনেক ভাষায় এক্ষেত্রে ও বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচনে প্রত্যয় যোগ করে তার পৃথক রূপ দেওয়া হয়। সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় একবচনে ও বহুবচনের রূপ পৃথক।

সর্বনামের রূপে বাংলায় ফরাসি ভাষার মতো বচনের অব্যর্থ প্রভাব রয়েছে। একবচন ও বহুবচন সর্বনামের রূপ পৃথক হয়ে থাকে। যেমন - আমি-আমরা, তুমি-তোমরা ইত্যাদি।

বাংলায় সর্বনামের রূপতত্ত্বে বচনের প্রভাব থাকলেও আবার বিশেষণের ক্ষেত্রে এর বিশেষ প্রভাব নেই। একবচন ও বহুবচনে বিশেষণের রূপ একই রকম হয়ে থাকে। যেমন- ভাল ছেলে, ভাল ছেলেরা। শুধু বিশেষণের দ্বিত্ব সাধন করে কখনো কখনো তার দ্বারা বহুবচনের কাজ করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় না। যেমন- একবচন-পাকা কথা, বহুবচন-পাকাপাকা কথা। বিশেষণের রূপ নিয়ন্ত্রনে বচনের ভূমিকায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজির সাদৃশ্য আছে, অন্য দিকে সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি থেকে বাংলার পার্থক্য লক্ষণীয়। বাংলার মতো ইংরেজিতেও একবচন ও বহুবচনে বিশেষণের রূপ একই থাকে। যেমন - একবচন- good boy, বহুবচন-good boys। কিন্তু সংস্কৃত, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় বচন ভেদে বিশেষণেরও রূপভেদ হয়।

যেমন - সংস্কৃত-সুশীল- নরঃ সুশীলঃ নরাঃ ; জার্মান- guter mann, gute manner; ফরাসি- bon homme, bons hommes।

বাংলায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রনে বচনের কোনো ভূমিকা নেই, কারণ বাংলায় একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার রূপ একই, যেমন- একবচনে- আমি যাই, বহুবচন-আমরা যাই, এক্ষেত্রে প্রথমেই বাংলার স্বাতন্ত্র্য চোখে পরে। সংস্কৃত, জার্মান, ফরাসি ও হিন্দি ভাষা তেকে। সংস্কৃত, হিন্দি, জার্মান ও ফরাসিতে বচন ভেদে ক্রিয়ার রূপ পৃথক হয়।

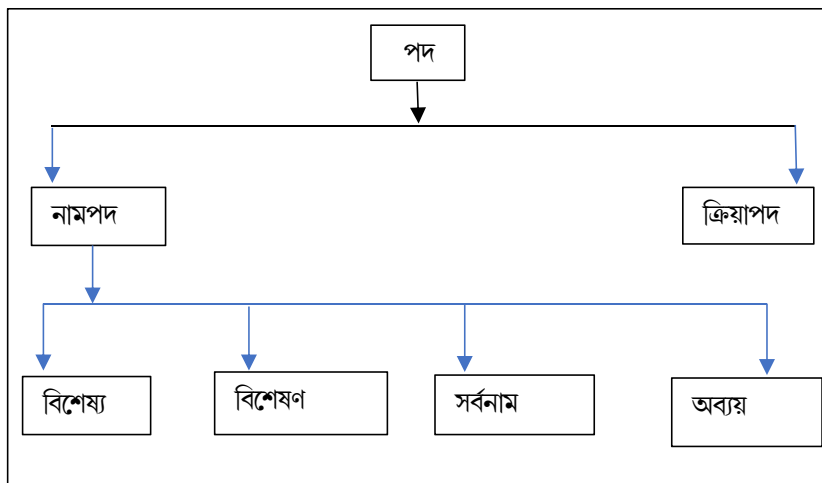
১.৬.৭. পদ-প্রকরণ :

পদ (Parts of Speech):

১। সংজ্ঞা : বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতুকে পদ বলে।

যেমন- ‘এসো বই পড়ি’। এখানে তিনটি একক। ‘এসো’, ‘বই’, ‘পড়ি’। এই তিনটি শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে বলে এগুলি হলো এক একটি শব্দ। তবে প্রতিটি শব্দই কোনো না কোনো বিভক্তি যুক্ত না হলে শব্দই থাকবে, পদ হবে না। এখানেই শব্দ ও পদের পার্থক্য।

২। পদের শ্রেণিবিভাগ:



পদ প্রধানত দু শ্রেণীর- ‘নামপদ’ ও ‘ক্রিয়াপদ’।

নামপদ : ৪ প্রকার-বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়। সুতরাং দু শ্রেণী মিলে পদ মোট ৫ প্রকার।

নামপদ - বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিয়ুক্ত শব্দকে নাম পদ বলে।

ক্রিয়াপদ - বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিয়ুক্ত ধাতুকে ক্রিয়াপদ বলে।

১. বিশেষ্যপদ (Noun):

যে পদে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ বা ক্রিয়ার নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন- রবীন্দ্রনাথ, ছাতা, বাঙালী, দয়া, বিশ্রাম প্রভৃতি।

প্রকারভেদ : বিশেষ্য পদ ৬ প্রকার:

১. শব্দ হলো = অর্থযুক্ত ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি। যেমন- সুদীপ্ত মানে একজনের নাম।

হাতি- এক শ্রেণীর প্রাণী। তাই সুদীপ্ত ও হাতি- দুটি শব্দ।

ধাতু (Verbal Root) হলো = ক্রিয়ার মূল অর্থযুক্ত অবিভাজ্য অংশ অর্থাৎ ক্রিয়ার যে অংশে কোনো কাল বা ভাব বা

পুরুষ ইত্যাদির বিভক্তি যোগ হয়, তাকে ধাতু বলে। যেমন- দেখ, কর, ডাক, যা ইত্যাদি। উদাহরণ - ‘দেখিল’

একটি ক্রিয়াপদ। এটি ভাঙলে পাই দুটি অংশ- দেখ+ইল। এখানে দেখ = ধাতু, ইল = বিভক্তি। যেমন- কর + ই = করি।

১) **ব্যক্তিবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বা নামবাচক** : যে বিশেষ্য পদে কোনো প্রাণী বা অপ্রাণীর নাম বোঝায়- জীবনানন্দ, বিমলাকান্ত, কৃষ্ণা, সোমা (প্রাণী); কোলকাতা, গঙ্গা, মহাভারত, হিমালয়, আকাশ, বাতাস, জল (অপ্রাণী)।

২) **বস্তুবাচক** : যে বিশেষ্য পদে কোনো বস্তু বা জিনিসের নাম বোঝায়- ছাতা, জুতো, তেল, জল, আকাশ, বাতাস, ভাত, ডাল।

৩) **জাতিবাচক** : যে বিশেষ্য পদে কোনো জাতির নাম বোঝায়-মানুষ, গরু, ছাগলক, বেড়াল, পাখি, বাঙালী, পাঞ্জাবী, ব্রিটিশ।

৪) **গুণ বা ভাববাচক** : যে বিশেষ্যপদে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির গুণ বা অবস্থার নাম বোঝায়-দয়া, মায়া, রাগ, ঘৃণা, বিদ্যা, ক্ষমা, ভালোবাসা, প্রেম।

৫) **ক্রিয়াবাচক** : যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়া বা কাজের নাম বোঝায়-খেলা, ভোজন, দর্শন, শয়ন, বিশ্রাম, মিলন।

৬) **সমষ্টিবাচক** : যে বিশেষ্য পদে দলগত বা সমষ্টিগত এক জাতীয় বস্তু বা ব্যক্তির নাম বোঝায়-ছাত্র, শিক্ষক, উকিল, কবি, লেখক, মেলা, সমারিক বাহিনী, যোদ্ধা, চোর, অধ্যাপক, ‘দাদা’, ‘নেতা’, ‘মন্ত্রী’, পুরোহিত, পীর, ঠাকুর, দেবতা, খন্দের, বিক্রেতা, উপাচার্য।

২. বিশেষণ (Adjective) :

যে পদে বিশেষ্য বা অন্যপদের (বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া) দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ বোঝায়, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

যেমন - সাদা কাপড়, ভালো ছেলে, বিশ্রী গন্ধ, নীল আকাশ, পরন্তু বেলা- এখানে প্রতিটি বাক্যের প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দটির দোষ, গুণ, অবস্থা প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছে। তাই প্রতিটি প্রথম শব্দ বিশেষণ পদ।

প্রকারভেদ: বিশেষণ পদ প্রধানভাবে দু প্রকার। নাম বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ।

নাম বিশেষণ চার প্রকার- বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, সর্বনামের বিশেষণ, অব্যয়ের বিশেষণ। সুতরাং

দুই মিলে বিশেষণ মোট পাঁচ প্রকার। যথা -

১। **বিশেষ্যের বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদে বিশেষ্যের দোষ গুণ অবস্থা বোঝায়। -হেঁড়া তার, অন্ধকার রাত, বাজে কথা। ভীষন চোর।

২। **বিশেষণের বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদে অন্য একটি বিশেষণের দোষ গুণ অবস্থা বোঝায় - খুব হেঁড়া তার, বড় অন্ধকার রাত, এত বাজে কথা। মহা-কবি-রবীন্দ্রনাথ। অতিবড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুন।

৩। **সর্বনামের বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদে সর্বনামের দোষ গুণ অবস্থা বোঝায়। -মুখ তুই এসন কি বুঝবি, এবার স্বকীয় কল্পনা ছাড়া।

৪। **অব্যয়ের বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদে অব্যয়ের দোষগুণ অবস্থা বোঝায়। -ধিক ধিক ওরে শত ধিক তোরে, ঠিক যেন প্রেতের কাহিনী।

৫। **ক্রিয়ার বিশেষণ** : যে বিশেষণ পদে ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ অবস্থা বোঝায়।- সে চোখে ভালো দেখে। আচ্ছা বলেছিস। ধীরে ধীরে পড়ো। জোরে বাতাস বইছে। চাকা ঘোরে বনবন। দেখা মাত্র গুলি হবে।

৩. সর্বনাম (Pronoun):

যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

একটি অনুচ্ছেদে যদি একটি বিশেষ্য পদ বারবার বসে, তাহলে তা শুনতে ভালো লাগে না। তাতে ভাষার মাধুর্য্য নষ্ট হয়। এই দুই দোষ দূর করতে ঐ বিশেষ্যটির পরিবর্তে যে পদ বসে, তাই হলো সর্বনাম। যেমন- “রবীন্দ্রনাথ বড় কবো। রবীন্দ্রনাথ বহু উপন্যাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বহু গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভালোবাসি। রবীন্দ্রনাথের রচনা সকলে পেরে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেয়েছেন”। এই যে বারবার ‘রবীন্দ্রনাথ’, ‘রবীন্দ্রনাথ’ শব্দটির ব্যবহার, তা শুনতে ভালো লাগে নি, তা সৌষ্ঠব নষ্ট করেছে। কিন্তু যদি বলি “রবীন্দ্রনাথ বড় কবি। তিনি বহু উপন্যাস লিখেছেন। তিনি বহু গল্প লিখেছেন। তাঁকে আমরা ভালোবাসি। তাঁর রচনা সকলে পড়ে। তিনি নোবেল পেয়েছেন”। এই যে ‘রবীন্দ্রনাথ’ নামক বিশেষ্য পদটির পরিবর্তে ‘তিনি’, ‘তাঁকে’, ‘তাঁর’ ইত্যাদি পদ ব্যবহার করা হলো-ওগুলি হলো সর্বনাম পদ। অর্থাৎ সর্বনাম পদ হলো বিশেষ্য পদের বিকল্প।

প্রকারভেদ : সর্বনাম পদ প্রধানত ৬ প্রকার-

- ১) **পুরুষ বা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য :** ব্যক্তির পরিবর্তে বসে- আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, সে, তারা, তিনি, তাঁরা, আপনি, আপনারা, আমাকে, তোমাকে, তোকে, তাকে, আমার, তাঁর, আমাদের, তাঁদের প্রভৃতি।
- ২) **নির্দেশক :** এই, ইনি, এটি, ঐ, উনি।
- ৩) **অনির্দেশক :** কেউ, কিছু, কোনো, কেন।
- ৪) **প্রশ্নবাচক :** কে, কি, কোথায়, কেন।
- ৫) **সম্বন্ধ বাচক:** যে, যা, যিনি, যারা, যাকে, যেমন, তেমন।
- ৬) **আত্মবাচক:** স্ব, নিজ, আপন।

৪. অব্যয় (Indeclinable) :

বিভক্তি লিঙ্গ বচন ভেদে যে পদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় বলে।

যেমন- ও, বা, বরং, নতুবা, বটে, কিন্তু, পরন্তু, অথবা, অথচ, সঙ্গে, বিনা, সমান, মতন।

প্রকারভেদ: অব্যয় প্রধানভাবে তিন প্রকার- পদান্বয়ী, সমুচ্চয়ী, অনন্বয়ী। এছাড়া আছে অনুকার অব্যয়।

ক) পদান্বয়ী : যে অব্যয় পদ বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের সঙ্গে অনুয় বা মিলন ঘটায়।

যেমন- আমি তোর সাথে যাব, কি জন্যে এখানে আসবি, দুঃ বিনা সিখ লাভ হয় কি মহীতে, ভূতের মতন চেহারা জেমন, আজি হলে শতবর্ষ পরে, শেষ পর্যন্ত লোকটা মরে গেল।

খ) সমুচ্চয়ী বা বাক্যান্বয়ী : যে অব্যয় পদ একাধিক পদ, বাক্য বা বাক্যাংশকে যুক্ত করে।

যেমন- আমরা পড়বো আর খেলবো, কাতা ও পেন নিয়ে আয়, মারতে মারতে লোকটা মরে গেল কিন্তু কেউ এলো না, তুমি আসবে বলে আমি দাঁড়িয়ে আছি।

গ) অনন্বয়ী : যে অব্যয় পদের সঙ্গে বাক্যের প্রত্যক্ষ যোগ নেই, অথচ মনের ভাব প্রকাশে যাদের ব্যবহার হয়। যেমন- ধিক ধিক ওরে শতধিক তোরে, দূর ছাই এ কী করছে (ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ), বেশ বেশ চমৎকার হয়েছে, (প্রশংসাসূচক) এ তো ভাবতে পারি না (বিস্ময়সূচক), কাল আসবো তো (প্রশ্নবোধক), বেশ তো কাল এসো (অনুমোদন সূচক), বাপরে কি সাপাটা (ভয়সূচক)।

অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : এছাড়াও আর এক শ্রেণীর অব্যয় আছে, তা হলো অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়। যেমন- বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর, চরকার ঘর ঘর পড়শীর ঘর ঘর, বকবক কলসীর বকবক শোন গো। শরীর ম্যাজম্যাজ করছে।

৫. ক্রিয়াপদ (Verb):

যে পদে কোনো কাজ করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

যেমন- আমি বই পড়ি। সে বেড়াতে গেল। লোকটা মরেছে।

প্রকারভেদ: ভাষাবিজ্ঞানীরা ক্রিয়াপদের নানাভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

(১) এক শ্রেণীর প্রকারভেদ -

ক্রিয়াপদ সাধারণত দু-রকম - সমাপিকা ও অসমাপিকা

ক) সমাপিকা ক্রিয়া : যে ক্রিয়াপদে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়। -আমি বই পড়ি। হাঁদ উটেছে। ওরা চলে গেল। কবি কাব্য লেখেন।

খ) অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। ‘আমি বই পড়ে’ বললে অর্থ সম্পূর্ণ হলো। তাই ‘পড়ে’ ক্রিয়াটি অসমাপিকা ক্রিয়া। এমনি হাসতে, ধরতে, ফাঁস করতে, ডেকে ইত্যাদি শব্দগুলি অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।

(২) ক্রিয়ার অন্য শ্রেণীর প্রকারভেদ -

অন্যভাবেও ক্রিয়াকে দু ভাগে করা যায়- সক্রমক ও অক্রমক।

ক) **সক্রমক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে। যেমন- আমি বই পড়ি। এখানে পড়া ক্রিয়াটির কর্ম হলো- বই। তাই এটি সক্রমক ক্রিয়া।

খ) **অক্রমক ক্রিয়া** : যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম নেই। যেমন- আমি পড়ি। এই পড়ি ক্রিয়ার কোনো কর্ম নেই। তাই এটি অক্রমক ক্রিয়া। তেমনি-আসা, যাওয়া, হাসা, কাঁদা, হারা, জেতা, বাঁচা, মরা প্রভৃতি অক্রমক ক্রিয়া।

দ্বিক্রমক ক্রিয়া : আরো একশ্রেণীর ক্রিয়া আছে, তার নাম-দ্বিক্রমক।

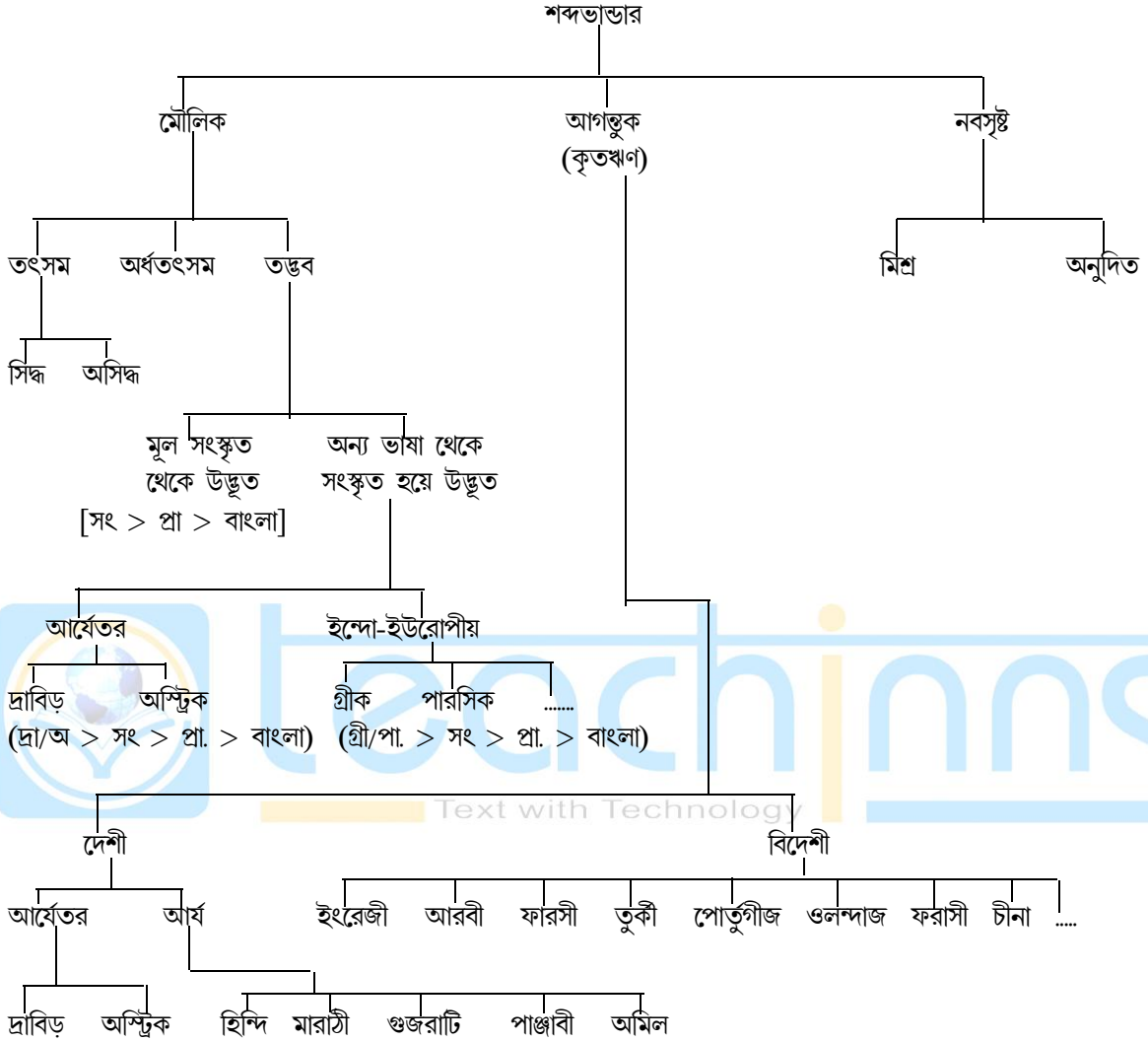
যে ক্রিয়ার দুটি করে কর্ম থাকে তাকে দ্বিক্রমক ক্রিয়া বলে। যেমন- আমাকে একটা গান শোনাও। এখানে কী শোনাও?- গান। তাই ‘গান’ একটি কর্ম। এটি মুখ্যকর্ম, এটি বস্তুবাচক। কাকে শোনাও?-আমাকে। ‘আমাকে’ একটি কর্ম-এটি গৌণ কর্ম, এটি ব্যক্তিবাচক। তাই দ্বিক্রমক ক্রিয়ায় দুটি কর্ম তাকে- একটি বস্তুবাচক, তা মুখ্য কর্ম। অন্যটি ব্যক্তিবাচক, তা গৌণকর্ম।



teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 7

১.৭.১ বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার :



ভূমিকা : শব্দভান্ডার

‘ভান্ডার’, বললেই লোকে সঞ্চয়স্থানকে বোঝে। যেমন ধনের ভান্ডার ‘ধনভান্ডার’ (ধনাগার), রত্নের ভান্ডার ‘রত্নভান্ডার’ (রত্নাগার), অস্ত্রের ভান্ডার ‘অস্ত্রভান্ডার’ (অস্ত্রাগার)। তেমনি, শব্দের ভান্ডার ‘শব্দভান্ডার’ বললেই লোকে Dictionary বা অভিধান বোঝে। কিন্তু ‘অভিধান’ই শব্দভান্ডারের সব নয়, শেষ কথা নয়। অভিধান ছাড়াও লক্ষ লক্ষ শব্দ আছে মানুষের সাহিত্যে, মানুষের মৌখিক কথাবার্তায়, অভিধান যার নাগাল পায় না।

এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য - যে ভাষার শব্দভান্ডার যত সমৃদ্ধ, সেই ভাষা ততই উন্নত, ততই সম্পদশালী। কারন, একমাত্র ভাষাই পারে মানুষের যত অনুভূতি আছে, তাদের সকলকে প্রকাশ করতে, বিশ্বে যত বস্তু আছে, তাদের পরিব্যক্ত করতে। আর ভাষার প্রাণ হলো শব্দ। তাই যে-ভাষায় যত বেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা তত বেশি - তার মান্যতা ততই বৃদ্ধি পায়, সাহিত্য রচনার ততই সে ভাষা অনুকূল হয়ে ওঠে।

কোনো ভাষার শব্দভান্ডার কেমন সমৃদ্ধ তা জানতে হলে, আমাদের নিজেদের সমৃদ্ধ হওয়ার দিকটি লক্ষ্য করতে হবে। আমাদের সমৃদ্ধির মূলে আছে প্রধান ৩টি সূত্র - (ক) আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে কী পেয়েছি, (খ) অন্যদের কাছে ঋণ বা সাহায্য পেয়েছি, (গ) নিজে কী উপার্জন করেছি। একটি ভাষার শব্দভান্ডারও এরকম তিনটি সূত্রেই সমৃদ্ধি লাভ করে :

এক ॥ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দাবলীর সাহায্যে।

দুই ॥ অন্যভাষা থেকে ঋণ প্রাপ্ত শব্দের সাহায্যে।

তিন ।। নতুন ভাবে সৃষ্ট শব্দের সাহায্যে। সাধারণত মূল ধাতু বা শব্দের সঙ্গে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্ট হয়।

এই তিন সূত্রের নাম : এক । নিজস্ব বা মৌলিক শব্দ।

দুই । আগন্তুক শব্দ (কৃতঞ্চ শব্দ)।

তিন । নব সৃষ্ট শব্দ।

বাংলা শব্দভান্ডারে মৌলিক শব্দ বা নিজস্ব শব্দ :

বাংলাভাষার জন্মকাল দশম শতাব্দী। সেদিন থেকেই এমন শব্দ বাংলা শব্দ-ভান্ডারের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যেগুলি অন্য কোনো ভাষা থেকে আসে নি, বা অন্য কিছু প্রত্যয় দিয়ে তৈরী হয়ে আসেনি - এগুলি হচ্ছে জন্ম বা উত্তরাধিকার সূত্রে সংস্কৃত থেকে। অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে এমন অনেক শব্দ বাংলা ভাষায় হয় অবিকৃত ভাবে, না-হয় কিছু পরিবর্তিত হয়ে বাংলা শব্দভান্ডারে এসেছে। এই গুলিকে ‘মৌলিক শব্দ’ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : এমন অনেক দ্রাবিড়, অস্ট্রিক বা অন্য ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শব্দ আছে, যেগুলি একদা সংস্কৃতভাষা গ্রহণ করেছিল, এবং কিছু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে। এই গুলিকেও ভাষাচার্য ড. সুকুমার সেন বাংলা শব্দভান্ডারের মৌলিক শব্দ বলেছেন - কারন, এগুলিও বাংলাভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, দেশীয় ঐতিহ্য থেকে পেয়েছে। সুতরাং,

বাংলা ভাষার জন্মের আগেই যদি কোনো শব্দ সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং যদি সেগুলি অবিকৃত ভাবে বা অল্প বিস্তর পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে সেগুলিকে মৌলিক শব্দ বলে।

এজন্যে মৌলিক শব্দগুলিকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন : (১) তৎসম (২) অর্ধতৎসম (৩) তদ্ভবা। প্রাচীন প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা বলেছেন - ‘তৎ’ মানে ‘সংস্কৃত’ - ‘বৈদিক’ ও ‘সংস্কৃত’ দুটোই।

(১) তৎসম (Tatsama) :

‘তৎসম’ মানে সংস্কৃতের মতো বা সংস্কৃতের সমান। অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃতভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাভাষায় অবিকৃত ভাবে এসেছে, সেগুলিকে তৎসম শব্দ বলে।

বাংলা ভাষায় এর রাশি উদাহরণ আছে। তার মধ্যে কিছু শব্দ হলো -

সূর্য	চন্দ্র	জ্যোৎস্না	রাত্রি	কৃষ্ণ	বিষ্ণু	বৈষ্ণব	যাত্রী
বজ্র	বৃষ্টি	বন্যা	বর্ষা	চঞ্চল	চক্ষু	রৌদ্র	ফর্সা
পুত্র	কন্যা	বন্ধু	পাত্রা	ভৃত্য	দস্যু	শিক্ষা	ছাত্র
অশ্ব	ডিম্ব	সিংহ	শক্তি	বন	বৃক্ষ	প্রাঞ্জল	ভক্তি

তৎসম শব্দ দুই প্রকার - ‘সিদ্ধ তৎসম’ ও ‘অসিদ্ধ তৎসম’।

অ. যে সব তৎসম শব্দ বৈদিক ও সংস্কৃতে পাওয়া যায়, সে গুলি ব্যাকরণ-সিদ্ধ, সেগুলি হলো ‘সিদ্ধ তৎসম’। যেমন - সূর্য চন্দ্র জল বায়ু ইত্যাদি শব্দগুলি।

আ. যে সব তৎসম বৈদিক ও সংস্কৃতে মেলে না এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ সিদ্ধ নয়, অথচ প্রাচীন কালে মৌখিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত হতো, সেগুলি হল ‘অসিদ্ধ তৎসম’। ভাষাচার্য সুকুমার সেন এর উদাহরণ দিয়েছেন -

কৃষান ঘর চল । টঙ্গ ডাল অঙ্কল (= অঙ্ক ব্যক্তি)।

ভাষাচার্য সুকুমার সেন বলেছেন, বাংলাভাষায় তৎসম শব্দ তদ্ভব শব্দের তুলনায় অনেক বেশী। তাই বাংলাভাষার প্রধান মূলধনই হলো এই তৎসম শব্দ। সেজন্যে যে-কোনো একটি ‘বাংলা ভাষার অভিধান’ উল্টালেই তৎসম শব্দের মহামিছিল লক্ষ্য করি ।।

(২) অর্ধতৎসম (Semi-tatsama) :

যে সমস্ত বৈদিক বা সংস্কৃত শব্দ সোজাসুজি বা অবিকৃত ভাবে বাংলায় তৎসমরূপে এসেছে এবং আসার পর দ্বিতীয় স্তরে কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, - সেগুলিকেই ‘অর্ধতৎসম’ বা ‘ভগ্ন তৎসম’ বলে। প্রধানত মৌখিক বা কথ্যভাষাতেই এর ব্যবহার।

যেমন : বৈদিক সংস্কৃত		বাংলায় প্রবেশ		বাংলায় পরিবর্তন (কথ্যভাষায়)	
		তৎসম রূপে		অর্ধ-তৎসম রূপ লাভ	
কৃষ্ণ	>	[কৃষ্ণ]	>	কেঁট	
ক্ষুধা	>	[ক্ষুধা]	>	ক্ষিদে , খিদে	
বৈদ্য	>	[বৈদ্য]	>	বদ্দি	
জ্যোৎস্না	>	[জ্যোৎস্না]	>	জোছনা	

নিমন্তন > [নিমন্তণ] > নেমন্তন

তেমনি : সূর্য > সূর্য্য, বৈষ্ণব > বোষ্টম, যজ্ঞ > যগণি, রৌদ্র > রোদুর, রাত্রি > রাতির, পুরোহিত > পুরুত, শ্রী > ছিরি, স্বামী > সোয়ামী, চক্র > চকর, মন্ত্র > মন্তর, যন্ত্র > যন্তর, পুত্র > পুতুর, বৃষ্টি > বিষ্টি, প্ৰনাম > পেন্নাম, গ্রাম > গেরাম, পথ্য > পথি, পিত্ত > পিতি, ঘৃণা > ঘেন্না, গৃহিনী > গিন্নী ॥

রাতির সুযষি সোয়ামী চকর। কেষ্ট বিষ্টি বোষ্টম মন্তর ॥

পথ্য যগণি বিষ্টি রোদুর। পিতি পেন্নাম বদি পুতুর ॥

(৩) তদ্ভব (Tat-bhava) :

(ক)	সংস্কৃত মূল > (হস্ত)	প্রাকৃত (পরিবর্তিত রূপ) > (হথ)	তদ্ভব (পরিবর্তিত রূপে বাংলা) (হাত)
আর্যেতর (দ্রাবিড়....)	সংস্কৃত	প্রাকৃত	তদ্ভব
(খ) মূল > ইন্দো-ইউরোপীয় (গ্রীক....)	গৃহীত >	(পরিবর্তিত রূপ) >	(পরিবর্তিতরূপে বাংলা)

যে সমস্ত (ক) সংস্কৃত শব্দ এবং (খ) সংস্কৃতে গৃহীত ‘আর্যেতর’ ও ‘ইন্দো-ইউরোপীয়’ গোষ্ঠীর অন্যান্য শাখার শব্দ, প্রাকৃত-স্তরের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে সেগুলির ‘তদ্ভব’ শব্দ বলে।

(‘আর্যেতর’ গোষ্ঠী হলো - ‘দ্রাবিড়’ (তামিল, মালয়ালাম, কন্নড়) ও ‘অস্ট্রিক’।

‘ইন্দো-ইউরোপীয়’ গোষ্ঠী হল - ‘গ্রীক’, ‘পারসিক’ প্রভৃতি।) যেমন :

১. বাংলাশব্দ - ‘হাত’। এর প্রাকৃত রূপ ছিল ‘হথ’। হথের সংস্কৃত বা মূল রূপ ছিল ‘হস্ত’। অর্থাৎ হাত < হথ < হস্ত।

২. বাংলা শব্দ - দাম। এর প্রাকৃত রূপ ছিল ‘দন্ম’। দন্ম-র সংস্কৃত রূপ ছিল ‘দ্রম্য’। ‘দ্রম্য’র উৎসমূল ছিল গ্রীক শব্দ - ‘দ্রাখমে’।

অর্থাৎ দাম < দন্ম < দ্রম্য < দ্রাখমে।

(ক) মূল সংস্কৃত (উৎস) থেকে উদ্ভূত তদ্ভব : সূত্রে উদ্ধৃত তদ্ভব :

সংস্কৃত >	প্রাকৃত >	বাংলা তদ্ভব	সংস্কৃত >	প্রাকৃত >	বাংলা তদ্ভব
কার্য	কজ্জ	কাজ	স্বর্ণ	সোন্ন	সোনা
গাত্র	গাঅ	গা	ষোড়শ	সোলহ	ষোল
অঞ্চল	অংচল	আঁচল	সম্বা	সন্বা	সাঁজ
উপাধ্যায়	উবজ্বাঅ	ওবা	রাজিকা	রন্নিআ	রাণী
উষণপণ	উণহাণ	উনান	ইন্দাগার	ইন্দাআর	ইদারা
খাদ্য	খজ্জ	খাজা	একাদশ	এগগারহ	এগার
দুহিতা	ধিআ	ঝি	চক্র	চক্ক	চাক
মৃত্তিকা	মট্টিয়া	মাটি	পিতৃস্বকা	পিউসস্‌সিয়া	পিসি

অক্ষবাটক অক্‌খআড়অ আখড়া

বাপ পিসি মেয়ে ছা । হাত চোখ বুক গা ॥

ঘড়বাড়ি কাম ভুল । বাল মাটি সোনা চুল ॥

কাপড় উনান চাক । খাজা রাণী পাড়া ঢাক ॥

ইদারা এগার পা । তদ্ভব গুণে যা ॥

প্রাকৃত থেকে এসেছে বলে এগুলিকে ‘প্রাকৃতজ শব্দ’ও বলে। বলাবাহুল্য, এগুলির মধ্যেই হাজার হাজার বছরের ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মেলে ॥

(খ) অন্য ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত শব্দ, তা থেকে উদ্ভাষিকার সূত্রে উদ্ভূত তত্ত্ব :

বাংলা শব্দ ভাষায় এক শ্রেণীর তত্ত্ব শব্দ আছে, যেগুলি একদা অন্য কোনো ভাষার উৎস থেকে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করেছিল এবং সেগুলিই প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা-তত্ত্বের রূপ লাভ করেছে। এগুলিকে ‘কৃতঋণ’ শব্দ’ও বলে। এই জাতীয় শব্দ প্রধান দুটি গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃতে এসেছে। গোষ্ঠী দুটি হলো -

১. আর্যেতর গোষ্ঠী - যথা = দ্রাবিড়, অস্ট্রিক।
২. ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী - যথা = গ্রীক, পারসিক প্রভৃতি।

(১) আর্যেতর গোষ্ঠী থেকে :

ক. আর্যেতর-দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত হয়ে উদ্ভূত বাংলা তত্ত্ব :

তামিল (দ্রাবিড়)	>	সংস্কৃত	>	প্রাকৃত	>	বাংলাতত্ত্ব
কাল	>	খলপ	>	খল্ল	>	খাল
মুটে	>	মুকট	>	মুডঅ	>	মোটা (ছোট বোঝা)
ইরবু	>	ইঞ্চক	>	ইঞ্চঅ	>	ইচনা (মাছ বিশেষ)
পিল্লে	>	পিল্লিক	>	পিল্লিঅ	>	পিলে
কুটম্	>	ঘট	>	ঘড়	>	ঘড়া
উলবৈ	>	উলুপ	>	উলুঅ	>	উলু (খড়)

এছাড়া এরকম তত্ত্ব শব্দ হল : বাংলা (< দ্রাবিড়)

কোদাল (< কুদাল), কাজল (< কজ্জল), গোল (< গুড), চুম (< চুষ), তানা (< তালক) হেঁতাল (< হিঁতাল), বানা (< বনয়), কেয়া (< কেতক)।

ইচনা পিলে ঘড়া কাল। কাজল গোল চুম কোদাল ॥

হেঁতাল উলু মোট তানা। কেয়া ময়ূর মুকুট বানা ॥

খ. আর্যেতর-অস্ট্রিক গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত হয়ে উদ্ভূত বাংলা তত্ত্ব :

অস্ট্রিক	>	সংস্কৃত	>	প্রাকৃত	>	বাংলা তত্ত্ব
(অজ্ঞাত)	>	ঢক	>	ঢক	>	ঢাক
(অজ্ঞাত)	>	টোকয়তি	>	টুকই	>	টোকে

এছাড়া-টঙ্গ (সং প্রা টঙ্গ)। উচ্ছে, বিঙ্গা, টেঙ্গা, ডেঙ্গর, খোকা, খুকি প্রভৃতি।

ভাষাচার্য সুকুমার সেনের মতে, এগুলি ‘অজ্ঞাতমূল’।

(২) ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত হয়ে উদ্ভূত বাংলা তত্ত্ব :

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে গ্রীক, আরসিক প্রভৃতি।

গ্রীক উৎস : দ্রাখমে > সং দ্রম্য > প্রা দন্ম > বাং দাম

সুরিংকস > সং সুরঙ্গ > প্রা সুরঙ্গ > বাং সুরঙ্গ

সেমিদালিস্ > সং সমিতা > প্রা সমিতা > বাং সিমুই (= ময়দা, ময়দাজাত)

পারসিক উৎস : মুদ্রায় (= মিশর) > সং মুদ্র > প্রা মুদ্র > বাং মুদ্রা।

কর্শ (বস্ত্রমান বিশেষ) > সং কার্ষাপণ (= মুদ্রাবিশেষ) > প্রা কহাবণ > বাং কাহনা।

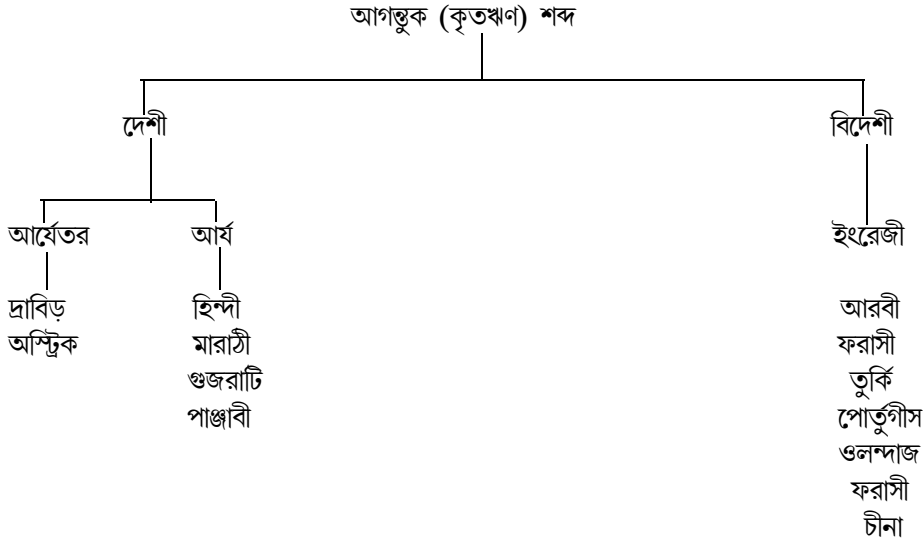
(অজ্ঞাত) > সং মোচিক > প্রা মোচিঅ > বাং মুচি।

(৩) ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠী থেকে সংস্কৃত হয়ে উদ্ভূত বাংলা তত্ত্ব :

তুর্কী উৎস : তিগির > সং ঠকুর > প্রা ঠকুর > বা ঠাকুর

তুর্ক > সং তুরকাঃ > প্রা তুরক > বা তুরক (= সওয়ার)

২. বাংলা শব্দভান্ডারে আগন্তুক (কৃতঋণ) শব্দ :



যে-শব্দ সংস্কৃত থেকে আসেনি, অন্য ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে, সেগুলিকে ‘আগন্তুক’ (কৃতঋণ) শব্দ (Loan words) বলে।

যেমন ‘স্কুল’ (School) ইংরেজী শব্দ। এটি ‘স্কুল’ বলেই সরাসরি বাংলায় গৃহীত হয়েছে,-সংস্কৃত-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে আসে নি, তাই ‘স্কুল’ আগন্তুক শব্দ। তেমনি ‘চেয়ার’, ‘টেবিল’, ‘ডাক্তার’,-সবই ইংরেজী ভাষা থেকে বাংলা ভাষা ঋণ হিসেবে পেয়েছে। এগুলি আগন্তুক শব্দ।

■ আগন্তুক শব্দের প্রকার ভেদ :

আগন্তুক শব্দ দুই প্রকার : (ক) দেশী (খ) বিদেশী।

(ক) দেশী আগন্তুক শব্দ :

দেশে উৎপন্ন ‘দেশী’। সংস্কৃত ভিন্ন, এদেশেরই অন্য ভাষা থেকে যে-সব শব্দ বাংলায় সরাসরি গৃহীত হয়েছে, তাদের ‘দেশী-আগন্তুক’ শব্দ বলে।

দেশী আগন্তুক শব্দ প্রধানত দুই প্রকার :

অ. অন-আর্য বা আর্যেতর-দ্রাবিড়, অস্ট্রিক।

আ. আর্য-হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী।

অ. প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রধানতভাবে দুটি জাতি ছিল- একটি ভারতের আদিম অধিবাসী - দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক গোষ্ঠী, যারা আর্যদের আসার আগেই এদেশে বসবাস করতো।

তাদের ভাষাকে বলে অন-আর্য-দেশী। এদের ভাষার অনেক শব্দ সরাসরি বাংলায় গৃহীত হয়েছে। এগুলিকেই বাংলা শব্দভান্ডারের ‘দেশী অন-আর্য আগন্তুক শব্দ’ বলা হয়।

যেমন : দ্রাবিড় থেকে সরাসরি আগত : আকাল। ইডলি (পিঠা বিশেষ), চেটি (পিঠা বিশেষ), চুরুট, দোসা (থোসা-পিঠা), তামিল

অস্ট্রিক থেকে সরাসরি আগত :

চুলা খড় উচ্ছে ঝাঙা । ঢিল ঢোল টেঁকি ডিঙা ॥

তোতলা খোকা মুড়ি চোঙা । বোল পেটা ঝাঁটা ডোঙ্গা ॥

আ. অন-আর্যদের বসবাসের অনেক পরে আর্যরা এদেশে আসে। তাদের ভাষা থেকে পরবর্তী হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি স্থানীয়ভাষার উদ্ভব ঘটে। এই ভাষা গুলি থেকে অনেক শব্দ সরাসরি বাংলায় গৃহীত হয়েছে। এগুলিকেই বাংলা শব্দ ভান্ডারের ‘দেশী আর্য আগন্তুক শব্দ’ বলাকে। যেমন :

হিন্দী থেকে আগত :

পয়লা দোসরা তেসরা থানা । চোঁঠা ঠাংর তের ঠিকানা ॥

ছন্ডি চিঠি বানি জোয়ার । গুজব তবু ফের চুড়িদার ॥

উল্টা বুরি পাটোয়ারী । পাঠান জুতো ধকলল ফিরি ॥
ভোর কুয়াশা চোঁঠা দাঙ্গা । ফেরফার চোট ঝাড়া নাঙ্গা ॥

মারাতী থেকে আগত : চৌথ, বগী
গুজরাটী থেকে আগত : তকলি, হরতাল
পাঞ্জাবী থেকে আগত : শিখ, চাহিদা

(খ) বিদেশী আগন্তুক শব্দ :

বিদেশী ভাষা থেকে যে সব শব্দ সারাসরি বাংলায় গৃহীত হয়েছে ; তাদের ‘বিদেশী আগন্তুক শব্দ’ বলে।
এই বিদেশী ভাষা গুলি হলো - আরবী, ফারসী, তুর্কী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজী, চীনা প্রভৃতি।

আরবী থেকে আগত : আল্লা, খুদা, মালিক, কবর। আইন আদালত খাজনা খবর ॥
তারিখ তামাম হাজির নবাব । দলিল দালাল ফাজিল জবাব ॥

ফরাসী থেকে আগত : জামা মোজা পোশাক দিন । বাদশা সাজা ফাঁদ হাসিল ॥
দরখাস্ত পেশ সওয়ার । বিলেত বীমা লাল বাহার ॥
শাদী সিপাই চাকরী জোর । জবর জিগির নিমক খোর ॥

তুর্কী থেকে আগত : কাঁচি চাককু লাশ বারুদ বেগম বিবি বোচকা কুলি।

পর্তুগীজ থেকে আগত : আতা, পৈপে, পেয়ারা, আনারস, সাণ্ড
চাবি, বোতল, বোতাম, গামলা, বালতি, সাবান, ফিতে।

ওলন্দাজ : ইম্পান,, রুইতন, হরতন, তুরুপ।

ফরাসী : কার্তুজ, কুপন।

ইংরেজী : স্কুল কলেজ নোট মাস্টার । চক পেনসিল বোর্ড ডাস্টার ॥
পেন পিন ব্যাগ ফাইল । বল বেঞ্চ চেয়ার টেবিল ॥

চীনা : চা, চিনি, লুচি, লিচু, কাগজ, তুফান।

বর্মী : লুঙ্গি, ঘুঘনী।

জাপানী : রিক্সা।

(৩) নব সৃষ্ট শব্দ :

বাংলায় এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলি একাধিক ভাষার শব্দের সংমিশ্রণে গঠিত অথবা কোনো বিদেশী শব্দের অনুবাদ করণে

উদ্ভূত - সেই শব্দ গুলিকেই ‘নব-সৃষ্ট’ বলা হয়।

এ-গুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) মিশ্র শব্দ।

(খ) অনূদিত শব্দ।

(ক) মিশ্রশব্দ :

ফুলমোজা = ফুল (ইংরেজী) + মোজা (ফারসী)
খানা-তল্লাসী = খানা (ফারসী) + তল্লাসী (আরবী)
জল-হাওয়া = জল (তৎসম) + হাওয়া (আরবী)
ঠেলা-গাড়ি = ঠেলা (দেশী) + গাড়ি (তদ্ভব)
বাক্স-বিছানা = বাক্স (ইংরেজী) + বিছানা (তদ্ভব)

(খ) অনূদিত শব্দ :

বিশ্ববিদ্যালয় < University ; অনুদান < Grant.
সংবাদপত্র < News Paper ; মাতৃভূমি < Mother land
হাতঘড়ি < Wrist Watch ; কাঁদানবে গ্যাস < Tear gas.
বর্ণা কলম < Fountainpen ; সাক্ষ্যআইন < Curfew.

১.৭.২ শব্দার্থ পরিবর্তন (শব্দার্থতত্ত্ব) :

১. শব্দার্থ তত্ত্ব : সংজ্ঞা (Semantics) :

অর্থযুক্ত ধ্বনি সমষ্টিই হলো ‘শব্দ’। সুতরাং শব্দ মাত্রেরই অর্থ থাকবে। কিন্তু সেই শব্দ সর্বদাই তার ‘আভিধানিক অর্থ’কে অবলম্বন করে চলে না। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে তার বারবার অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন- ‘হাত’ একটি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ = ‘মানুষের অঙ্গ বিশেষ’ (Hand)। কিন্তু যদি বলি-‘এটা পাকা হাতের কাজ’। তখন ‘হাত’ শব্দটির অর্থ হয় ‘পটুত্ব বা দক্ষতা’। যদি বলি ‘তোমার হাতযশ আছে’, তখন হাতের অর্থ ‘খ্যাতি’। যদি বলি ‘বাবুকে তুমি হাত করেছিস’, তখন হাতের মানে ‘বশে আনা’। তেমনি ‘হাতে খড়ি’ (প্রথম শিক্ষা), ‘হাতখরচ’ (খচরোখরচ), ‘হাত বাঁধা’ (নিরুপায়), ‘হাতেধরা’ (অনুরোধ) ইত্যাদি। সুতরাং ‘হাত’ একটি শব্দ-কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে তার নানা অর্থ, তার বহু রকমের মানে। এই হলো শব্দার্থ পরিবর্তন বা শব্দার্থতত্ত্ব।

ভাষার মধ্যে শব্দের অর্থ-পরিবর্তনের বিচিত্র রূপরেখা ভাষাবিজ্ঞানের যে-শাখায় আলোচিত হয়, তাকে শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) বলে।

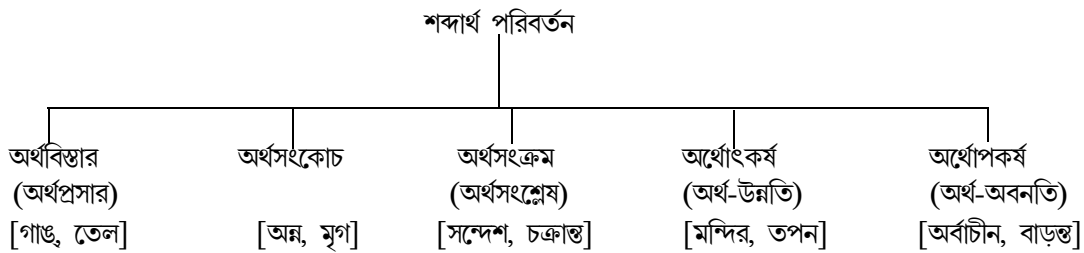
ড. সুকুমার সেন বলেছেন : ‘শব্দার্থতত্ত্ব ঠিক ব্যাকরণের অঙ্গ নয়। তবে ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনায় ইহা আবশ্যিক অনুষঙ্গ’। চমকি শব্দার্থের উপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতো অনেকেরই ধারণা, ভাষার প্রাণসম্পদ হলো শব্দার্থ। ভাষার আভ্যন্তরীণ গঠন এই অর্থের উপরই নির্ভর করে। অর্থ জেনেই ভাষার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ করা উচিত। সেজন্যে শব্দার্থতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ॥

২. শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ :-

শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ (= ১৫টি)

কারণ	উদাহরণ
১. ভিন্ন পরিবেশগত	(কলু = কুজাতি > -তৈল পেষণ যন্ত্র > -পেষণযন্ত্র)
২. ভিন্ন ভাষাগত	(মুর্গ = মোরগ - ফরাসীতে পাখি)
৩. ভিন্ন মানব গোষ্ঠীগত	(নীল = নীল, -গুজরাটিতে সবুজ)
৪. কালব্যবধান জনিত	(বিবাহ = বিশেষ বহন পরিণয়)
৫. অর্থনীতি পরিবর্তন গত	(ঝি = কন্যা > কাজের মেয়ে)
৬. সংস্কার-প্রথাগত	(Mother = মা > সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্তা নারী। লতা = সাপ)
৭. শোভনতা জনিত	(বাথরুম যাওয়া, স্বর্গগমন, হরিজন)
৮. শব্দ সাদৃশ্যজনিত	(তিল = শস্যদানা, দেহের তিল। রাজপথ, রাজহাঁস)
৯. অসতর্কতা / অজ্ঞতা জনিত	(পাশু = বৌদ্ধসন্ন্যাসী > নিষ্ঠুর)
১০. সাহিত্যিক-ব্যবহার	(বারুণী = বরুণের স্ত্রী (পূর্বে মদ্য)। ক্রন্দসী = আকাশ)
১১. অতিশায়িত ব্যবহার	(দা, দিদি, স্যার, বাবু মা)
১২. শব্দ সংক্ষেপজনিত	(নিউজপেপার > পেপার / খাবার জিনিস > খাবার)
১৩. অলংকার ব্যবহার জনিত	(বই-এর পত্র, কাণ্ড,, পর্বা ভীষণ সুন্দর। ধর্মপুত্র)
১৪. নম্রতা / ক্রোধ প্রকাশ জনিত	(গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো। শালা ছোটলোক)
১৫. প্রসঙ্গ পরিবর্তন জনিত	(মুখ, মাথা, হাত, কাঁচা - নানাঅর্থ)

৩. শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা :



ভাষাবিজ্ঞানে শব্দার্থ পরিবর্তন বা শব্দার্থতত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষা বড় সজীব বস্তু। সে নদীর স্রোতের মত। নদীর স্রোতের মতোই সে বার বার ধারা পরিবর্তন করে, পুরনোখাত ছেড়ে নতুন খাতে চলে। এমন করেই অনেক শব্দের এক-

কালের-প্রচলিত অর্থ,-পরবর্তীকালে বদলে যায়। নতুন শব্দের মিশ্রণে তার অর্থে নতুন ব্যঞ্জনা আসে। শব্দের এই অর্থ পরিবর্তনের এই ধারাবাহিককে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করেছেন :

এক ।। অর্থ-বিস্তার বা অর্থ-প্রসার ।

দুই ।। অর্থ সংকোচ ।

তিন ।। অর্থ-সংক্রম বা অর্থ-সংশ্লেষ ।

এছাড়াও শব্দার্থের উৎপত্তি (উৎকর্ষ) এবং অবনতি (অপকর্ষ) বিচার করেও শব্দার্থ পরিবর্তনের আরও দুটি ধারা উল্লেখ করা হয় :

চার ।। অর্থোৎকর্ষ ।

পাঁচ ।। অর্থাপকর্ষ ।

১. শব্দের অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার (Expansion of Meaning) :

যখন কোনো শব্দ তার বুৎপত্তিগত (সীমাবদ্ধ) অর্থ ত্যাগ করে ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করে, তখন শব্দের সেই অর্থ পরিবর্তনকে শব্দের অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার বলে।

যেমন :

(১) ‘গাঙ’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল ‘গঙ্গা নদী’। পরবর্তী কালে এর অর্থ পরিবর্তিত হলো ‘যে কোনো নদী’। এখন গাঙ মানে ‘যে কোনো নদীর শুকনো খাত’ ।

(২) ‘তেল’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল-‘তিলের নির্যাস’ বা তিল থেকে তৈরী নির্যাস। এখন তেল মানে তিলের নির্যাস তো বটেই, তিলছাড়াও সরষে, বাদাম, নারিকেল, তিসি, রেড়ি, মছয়া ইত্যাদি যে কোনো শস্যাদানা থেকে তৈরী যে কোনো নির্যাস। এখন অভোজ্য কেরোসিন, পেট্রলকেও তেল বলা হয়।

(৩) তেমনি ‘কালি’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল কালো রঙের তরল, যা দিয়ে লেখা হয়। এখন এর অর্থ প্রসারিত হয়ে দাঁড়িয়েছে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি যে কোনো রঙের তরল।

(৪) অর্থ বিস্তারের আরও কিছু নমুনা :

শব্দ (বুৎপত্তি)	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
১. নগর = ন + গম্ + ড ; নগ + র (অন্ত্যর্থে)	পাহাড়ের উপরিস্থিত জনস্থান	শহর।
২. পাণি গ্রহণ = পণ্ + ই ; গ্রহ + অনট	হস্ত ধারণ	বিবাহ।
৩. মধুর = মধু + র	মধুযুক্ত	সুস্বাদু।
৪. যথেষ্ট = যথা-ইষ্ + ভ্র	ইষ্টকে অতিক্রম না করে	প্রচুর।
৫. রাজ্য = রাজন্ + য (যক)	রাজার শাসিত দেশ	স্বাধীন দেশ।

২. অর্থ সংকোচ (Reduction of Meaning) :

যখন কোনো শব্দ তার ব্যাপকতর অর্থ হারিয়ে কোনো সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় তখন তাকে অর্থের সংকোচ বলে।

(১) ‘অন্ন’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল ভাত রুটি প্রভৃতি যে কোনো খাদ্য। এখন অর্থের সেই ব্যাপকতা হারিয়ে অন্ন মানে দাঁড়িয়েছে শুধু ভাত।

(২) ‘মৃগ’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল যে কোনো পশু। এখন শব্দটি তার এই অর্থ ব্যাপকতা হারিয়েছে। এবং অর্থ দাঁড়িয়েছে-হরিণ নামের একবিশেষ পশু।

(৩) ‘সম্বন্ধী’ একটি শব্দ। এর প্রাচীন অর্থ ছিল বড় ব্যাপক-যার সঙ্গে সমবন্ধ আছে সেইই সম্বন্ধী। এখন শব্দটি সেই ব্যাপক অর্থ হারিয়েছে। সংকীর্ণ অর্থ পেয়েছে-স্ত্রীর ভাই বা শ্যালক।

(৪) অর্থসংকোচের আরও কিছু উদাহরণ :

শব্দ (বুৎপত্তি)	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
১. ভৃত্য = √ ভৃ + ক্যপ	ভরণের যোগ্য	চাকর
২. ঘাস = √ অদ্ + ঘণ্ড	খাদ্য	তৃণ
৩. বাসর = √ বাস + অর	বাসগৃহ	সদ্য বিবাহিত বরবধূর থাকার ঘর
৪. হস্তী = হস্ত + ইন্	হস্তের মত অঙ্গ যার	হাতী
৫. অসুখ = ন + সুখ	সুখের অভাব	রোগ

৩. অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ বা অর্থরূপান্তর (Atteration or Transfer of Meaning) :

যদি কোনো শব্দের অর্থ ধাপে ধাপে বারবার পরিবর্তিত হতে হতে এমন ধাপে এসে দাঁড়ায়, যখন তার আদি অর্থের সঙ্গে শেষ অর্থের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, (বা এক বস্তুকে অন্যবস্তু বলে মনে হয়) তখন তাকে অর্থরূপান্তর বা অর্থসংশ্লেষ বলে।

যেমন -

(১) ‘সন্দেশ’ একটি শব্দ। তার আদি অর্থ ছিল সংবাদ। সেকালে ডাক ব্যবস্থা ছিল না। তখন লোকে আত্মীয়ের বাড়িতে সংবাদ নিতে যেতো কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে। এই হিসেবে একদা এর অর্থ দাঁড়িয়েছিল মিষ্টান্ন। তখন যে কোনো মিষ্টান্নকেই সন্দেশ বলতো (সেটা হল অর্থপ্রসার)। তারপর অর্থসংকোচ হয়ে এখন সন্দেশের অর্থ দাঁড়িয়েছে এক বিশেষ শ্রেণীর মিষ্টি।

সন্দেশ > সংবাদ > মিষ্টান্ন > বিশিষ্ট মিষ্টি। -এই হল অর্থরূপান্তর বা অর্থ সংক্রম।

(২) ‘চক্রান্ত’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল-চাকার শেষভাগ। তারপর বার বার অর্থ পরিবর্তন হতে হতে এখন চক্রান্তের অর্থ দাঁড়িয়েছে ষড়যন্ত্র। কিন্তু চাকার শেষ-এই প্রাচীন অর্থের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই হলো শব্দের অর্থরূপান্তর বা অর্থসংক্রম।

(৩) ‘গবাক্ষ’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল গোরুর চোখ। তারপর কালে কালে তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে জানালা। একদা গৃহস্থের মাটির বাড়িতে এখনকার গোল-ঘুলঘুলির মতো ঘরের দেওয়ালের কোনোস্থানে ছোট ছিদ্র রাখা হতো। তাতে জানালার মতো হাওয়া বাতাস ঢুকতো। ঘর থেকেও বাইরের জিনিস দেখা যেতো। কিন্তু সেই অর্থে এখন লুপ্ত হয়েছে। এই যে গোরুর চোখের সঙ্গে এখনকার জানালার আকারের কোনো মিল নেই অর্থ আছে-এই হলো অর্থ রূপান্তর।

(৪) অর্থ সংশ্লেষের আরও কিছু উদাহরণ :

শব্দ	(বুৎপত্তি)	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
১. কান্ড	= কন্ + ড	গুঁড়ি	ব্যাপার।
২. ধর্ম	= √ ধৃ + ম (মন)	ধারণশীল	পুণ্যকাজ।
৩. শর্করা	= √ শৃ + কর (করচ)	কাঁকর	চিনি।
৪. বিরক্ত	= বি √ রম + ক্ত	রক্তহীন	অসন্তুষ্ট।
৫. পট	= পাটি + অ (অচ)	বস্ত্র	চিত্র।

৪. অর্থের উন্নতি বা অর্থোৎকর্ষ (Elevation of Meaning) :

যখন কোনো শব্দ তার মূল অর্থ (হীন বা সাধারণ) পরিত্যাগ করে কোনো উন্নত অর্থ গ্রহণ করে, তখন তাকে শব্দের উন্নতি বা উৎকর্ষ বলে।

যেমন -

(১) ‘মন্দির’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল গৃহ বা ঘর বা ঘুমানোর স্থান (মন্দির বাহির কঠিনকপাট। -গোবিন্দ দাস)। কিন্তু এখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে-দেবালয়। এখানে শব্দটির অর্থগত উন্নতি বা উৎকর্ষ ঘটেছে ধর্মীয় ভাবের সংযোগে। (ভকত মন্দির মাঝে দেবতা প্রবীণ-রবীন্দ্রনাথ)। (যে কোনো ঘর দেবতার ঘর)

(২) ‘তপন’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল যা তপ্ত করে। কিন্তু এখন এর অর্থের উন্নতি ঘটেছে। এখন তপন মানে সূর্য।

(৩) ‘দহিতা’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল দোহনকারিণী নারী। এখন এর অর্থের উন্নতি ঘটেছে। অর্থ দাঁড়িয়েছে কন্যা।

(৪) অর্থোৎকর্ষের আরও কিছু উদাহরণ :

শব্দ	(বুৎপত্তি)	আদি অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
১. গোধূলি	= গো + √ ধূ + লি (ক্লি)	গোরুর ক্ষুরের উৎক্ষিপ্ত ধুলো	সন্ধ্যা
২. পুরোহিত	= পুরস্ + √ ধা + ক্ত	অগ্নে স্থাপিত	পূজারী
৩. মার্জনা	= √ মার্জি + অ (অচ)	ঘষা-মাজা	ক্ষমা
৪. ধরা	= √ ধৃ + অ (অচ)	ধারণকারী	পৃথিবী
৫. দন্ড	= √ দন্ড + অ (অচ)	লাঠি	শাসন

৫. অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ (Deterioration of Meaning) :

যখন কোনো শব্দ অর্থপরিবর্তনের ফলে তার মূল উন্নত অর্থটি হরিজয়ে ফেলে নিম্নতর বা অবনত অর্থ প্রকাশ করে, তখন তাকে শব্দের অর্থাপকর্ষ বা অর্থাবনতি বলে।

যেমন -

(১) ‘অবচীন’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল নবীন। এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে মূর্খ। নবীন অর্থটি উৎকর্ষ জ্ঞাপক। মূর্খ শব্দটি অবশ্যই অপকর্ষ সূচক। এই যে শব্দের উন্নত অর্থ হারিয়ে অবনত অর্থে ব্যবহার, এই হলো অর্থাপকর্ষ।

(২) ‘অসুখ’ একটি শব্দ। এর আদিতে অর্থ ছিল সুখের অভাব (এটি উন্নত অর্থ)। কিন্তু এখন অসুখ শব্দের অর্থের অবনতি ঘটে দাঁড়িয়েছে রোগ।

(৩) ‘বাড়ন্ত’ একটি শব্দ। এর আদি অর্থ ছিল বা বাড়ছে। কিন্তু এর অর্থের অবনতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ফুরিয়ে যাওয়া। ঘরে চাল বাড়ন্ত মানে চাল নেই।

(৪) অর্থাবনতি / অর্থাপকর্ষের আরো কিছু নমুনা :

শব্দ	(বুৎপত্তি)	আদি শব্দ	পরিবর্তিত শব্দ
১. নাগর		নগরবাসী	অবৈধ প্রণয়ী
২. মহাজন		মহৎব্যক্তি	ঋণদাতা বা সুদের ব্যবসায়ী
৩. ঝি		মেয়ে	বেতনভোগী কাজের মেয়ে
৪. ধীবর	= ধ + বর (বরচ) (নিপাতিত)	বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ	জেলে
৫. অভিমান	= অভি- √ মন + অ (ঘঙ)	জ্ঞান	অহংকার
৬. বস্তি	= বস্ + ভি	বসতি	দরিদ্রদের ঘনবসতি-পূর্ণ পল্লী



Teachinns
Text with Technology